"আমরা প্রেম পাই না ; কেবল প্রেম দেই না বলিয়া। * * আমাদের যদি প্রেমই থাকিত, ঘরে ঘরে দশটা করিয়া উনান জলিত না, বিশটা করিয়া জাতি হইত না, ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব ভাতের হাঁড়িতে যাইয়া প্রবেশ করিত না।"

"এক একটা করিয়া বিপদের পাথর দিয়া যে বিরাট, বিস্তৃত মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহারই মধ্যে কীর্ত্তি দেবতার প্রতিষ্ঠা।"

"পরকে ভাল বাসিয়াছ কি? নিজের কথা ভুলিয়া যাইয়া মুখের গ্রাস ক্ষুধিতেরে তুলিয়া দিয়াছ কি? একটা ছাগ শিশুকে বাঁচাইতে চাহিয়া আপনার শির যুপকাঠে পাতিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, উপাসনায় তোমার কিসের প্রয়োজন?"

এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে আশা করি পুস্তিকাখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে।

খুকুর জন্ম।

(শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়)

কামনা-বাসনা-রূপে হৃদয়ে লুকায়ে ছিলি
আনন্দ মুরতি ল'য়ে খুকু হ'য়ে দেখা দিলি।
সন্ধ্যার সে মেঘমাঝে এঁকেছিনু ছবি তোর
জাগিত মা তোর তৃষা রজনী হইলে ভোর।
সাগরের ঢেউমাঝে দেখেছিনু তোর মুখ
জীবনে সাধনা মোর তুই মোর সব সুখ।
বিশ্বের মঙ্গল রাশি তুই মোর মা আমার
তুই মোর ব্রতপূজা বস্তু ধ্যান ধারণার।
আঁখি তোর আনে প্রাণে বিশ্বের বারতা রাশি
স্বর্গসুধা ঢালে প্রাণে তোর ক্ষুদ্র কল হাসি।
অমৃত সমান মাগো কোমল পরশ তোর
শব্দে ফুটে কত ভাষা শুনিয়া আপনা ভোর।
সুখে তুই সুখরবি দুখে তৃপ্তি সান্ত্বনার
নারীত্বের সার্থকতা বিধাতার উপহার।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

আগমনী

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস মা নবনী-হৃদয়া জননী মণিমঞ্জুষা করে,
হরষ ধারায় সরস করিয়া এস মা বরষ পরে॥
এস শারদ গগন মগন করিয়া শুচি জ্যোছনার বানে
বন-প্রান্তরে হরিত অরুণ ঘন তরুণিমা দানে।
এস প্রকটিয়া তারাপুঞ্জ—
এস গুঞ্জনে ভরি' কুঞ্জ—
কল কুজনে ভরিয়া নমেরুকুলায়, রঞ্জিয়া জলধরে॥
এস পয়স্বিনীর আপীন ভরিয়া মধুর গোরস রসে,
নিঃস্বের গৃহ শস্যে ভরিয়া, বিশ্ব ভরিয়া যশে।
এস পুষ্প ভরিয়া গন্ধে—
চারু মঞ্জুতা মকরন্দে—
এস হ্রদ-সরোবর ভরি কোকনদে কুমুদে ইন্দীবরে॥
এস নদনদী ভরি মীন-বৈভবে, কান্তার ভরি কাশে—
তরুলতা ভরি ফল-গৌরবে, তড়াগ ভরিয়া হাঁসে।
ভরি' শালি-সম্পদে ক্ষেত্র—
স্নেহ করুণায় ভরি নেত্র—
এস মুখরিত করি গিরিকন্দর নির্ঝর ঝরঝরে॥

এস শিশুর আস্য হাস্যে ভরিয়া, লাস্যে আঙিনা ভরি,
নব স্বাস্থ্যে ভরিয়া শীর্ণ অঙ্গ জীর্ণ জড়তা হরি'।
মাগো " বিতরি' অন্ন-স্তন্য—
কর সন্তানগণে ধন্য—
এস বিশ্বম্ভরা সন্তাপহরা বঙ্গের ঘরে ঘরে॥

সত্য ও সৌন্দর্য্য বোধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শুক্ল সন্ধ্যায় যে সত্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, ভাবের পর ভাবের রূপ দিয়া প্রাণের যে গতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা ত শেষে ব্যাকুল হৃদয়ের অশ্রুবর্ষণে, নির্ব্বাক অন্তরের সৌম্য সমাধিতে লয় পাইয়া গিয়াছে,—জ্ঞানের কথায়, সত্যালোচনায় ইহাতে ধরিবার বুঝিবার কি আছে? যে নিভৃত আনন্দ ইহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, গতির দিকে ছাড়া তাহার সম্যক উপভোগ আর কেমন করিয়া হইতে পারে? কোনও একটী উৎকৃষ্ট কবিতার প্রত্যেক অংশ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও তাহার এই আভ্যন্তরিক গতিটা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানব-মনের যে সূক্ষ্ম গতি, প্রাণের যে অব্যাহত স্ফূর্ত্তি ভাষার মধ্য দিয়া রূপে, রূপের মধ্য দিয়া ভাবে স্বতঃই প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে সঙ্গীতে, ছন্দে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা কাব্য-রচনারই অনুরূপ। কবির মনের স্বচ্ছন্দ গতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংস্কার হইতে স্খলিত হইয়া নিজের বেগেই ধাবিত হয়, সত্য এবং তথ্য ইহাকে সংযত করিলেও রুদ্ধ করিতে পারে না। কবিতার এইরূপ একটী অন্তর্গূঢ় স্বাভাবিকত্ব আছে। এবং ভাবের গভীরতা অথবা প্রজ্ঞালব্ধ দৃষ্টি যতই থাকুক না কেন, কবি যদি তাঁহার কবিতায় ভাব-ব্যঞ্জনার স্বাভাবিক গতিটা ফুটাইয়া তুলিতে না পারেন, তাঁহার মনের গতি যদি—তাঁহার কাব্যে স্বতঃ স্ফূরিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার কবিতায় সৃষ্টির আনন্দ পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক

জীবনের আড়ষ্ট ভাব কবিতায় নাই, জ্ঞানার্জ্জনের কষ্টসাধ্য চেষ্টা হইতে ইহা সম্ভূত নহে, কল্পনার উদ্দাম চাঞ্চল্য ইহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা আজি কালি এত যে সমাদৃত—তাহা তাঁহার তত্ত্বালোচনার জন্য নহে। যুক্তির আলোকে এ সব তত্ত্ব এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এত মর্ম্মস্পর্শী কারণ সমস্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া প্রকৃতির মূলে চিন্ময় শক্তির যে সাক্ষাৎ অনুভূতি তাঁহার হইয়াছে—তাহার সরল সুন্দর স্বাভাবিক ভাব ব্যঞ্জনা আমরা পাই তাঁহার কাব্যে। বাহিরের সামান্য সামান্য ঘটনাগুলি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য সত্য ও সৌন্দর্য্যরূপ ধারণ করে, তাঁহার এক একটী কবিতায় ভাবের গতির মধ্যে যেন তাহা ধরা পড়িয়াছে এবং জগতের চঞ্চল প্রকাশের ভিতর দিয়া অধ্যাত্ম চেতনার প্রসারিত সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের জন্য প্রতিভাত হইতেছে। সেই একই কারণে রবীন্দ্রনাথও বড়, তিনি মরমী কবি বলিয়া নহে,—তাঁহার অধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনার জন্য নহে,—কারণ ইহারাও আধ্যাত্মিকই হউক আর আধিভৌতিকই হউক বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা,—তিনি বড়, কারণ তাঁহার কবিতায় সমস্ত তত্ত্ব ও সত্যের ভিতর দিয়া তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য স্পর্শ করিয়াছেন। সাহিত্যে তত্ত্ব ও সত্য মিথ্যা, ভাব ও সৌন্দর্য্যই সত্য—সৌন্দর্য্যকে গভীরতা দিবার জন্যই সত্যের প্রয়োজন। আমাদের তত্ত্ব ও সত্য আজ আছে কাল নাই, ইহারা তখনই নিত্য যখন ভাবের সহিত বিজড়িত হইয়া সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত, সে কালের কত শত সত্য বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আজও ভারতের হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে।

সেইজন্য কোনও একটী উৎকৃষ্ট কবিতা গদ্যে পরিণত করিলে তাহার অন্তর-শ্রী থাকে না এবং অনুবাদে ইহার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইতে পারে না। প্রত্যেক অংশ সমগ্রের মধ্যে নিহিত, এবং সমগ্র ভাবটী প্রত্যেক অংশে প্রতিফলিত। কবিতা যেন নিয়তির নিগড়ে বাঁধা, সৃষ্টির রহস্যে ঢাকা, প্রাণের স্পন্দন হইতে কেমন করিয়া যে ইহা ভাষা, ভাব ও রূপের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। জোর করিয়া কবিতা লেখা চলে না। সত্য এবং তথ্যকে কল্পনায় ফলিত করিলেও তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য নহে, যদি প্রাণের অনুভূতি না থাকে, যদি মনের স্বচ্ছন্দ বিলাস আপন মাধুর্য্যে আপনি বিমোহিত না হয়। ইংরাজ-কবি পোপের ত সত্যের

কোনও খাঁট্‌তি ছিল না, কল্পনারও প্রাচুর্য্য ছিল—কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব আজ কোথায়? এবং তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গৃহীত হইত, আর তাঁহার আধুনিক আধ্যাত্মিক গবেষণা আমাদের হৃদয়ে এত নৈরাশ্যের সঞ্চার করিত না। যে গভীর অনুভূতি কবিকে পাগল করিয়া তুলে, তাহা সব সময়ে তাঁহার নিজের নিকটেই পরিস্ফুট হয় না। কস্তুরী মৃগের ন্যায় নিজের সৌরভে নিজে মত্ত হইয়া কবির মন গতিমুক্ত হইয়া যায়। কত মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক, কত ছন্দোবন্ধে কত আকারে ও ইঙ্গিতে তিনি সেই সৌরভকে ধরিতে চেষ্টা করেন,—প্রাণের বেদনা কথায় আধস্ফুট হইয়া প্রাণেতেই মিলাইয়া যায়, তাঁহার মনের তুষ্টি কিছুতেই হয় না, ব্যাকুলতা ব্যাকুলতাই রহিয়া যায়। সেই জন্য কবিতার যেন শেষ নাই, ইহার কথা বলিয়াও বলা হয় নাই। ইহা যে ভাবের রেখাপাত করিয়া চলে, তাহা ঈশ্বরের মধ্যে আলোকের স্পন্দনের মত প্রাণ হইতে প্রাণে চিরকালই স্পন্দিত হইতে থাকে। অনুভূতি মূলক * কবিতাকে জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ সুস্পষ্ট করা যায় না; এবং সামাজিক নীতিবাদ্ তাহাতে খাটে না। এই শ্রেণীর কবিতা আমাদের দেশে সাধারণ পাঠকের নিকট এখন পর্য্যন্ত সুপরিচিত হয় নাই বলিয়া ইহা লইয়া এত বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। বাস্তবিক অনুভূতি মূলক কবিতা কোনও দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া জনসাধারণের উপভোগ্য নহে। ইহা চন্দ্রালোকের স্বচ্ছ আবরণের মত বাস্তবের সুস্পষ্টতার উপর অলৌকিক কিরণ সম্পাতে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে। কবির সত্য যতই তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে, যতই ইহা অনুভূতির বিষয় না হইয়া জ্ঞানের বলিয়া বোধ হয়,—কবি যখন তাঁহার বিষয়কে ভিতর হইতে না দেখিয়া বাহির হইতে দেখিবার চেষ্টা করেন, ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারের, স্থির নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের,—সমভূমিতে আনিয়া ফেলেন ততই তাঁহার কাব্য গন্ধের রূপান্তর হইয়া পড়ে। এমন কি যখন কোনও কবিতায় একটী সুনিশ্চিত মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তখনও সেই কাব্যের উৎকর্ষ উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের উপর ততটা নির্ভর করে না, এই উদ্দেশ্যকে ঘেরিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে যে ভাবের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, যতটা ইহা তাহার উপর নির্ভর করে। কোন

* Romantic Poetry অনুভূতিমূলক কবিতা। আমি আমার "সাহিত্যে অনুভূতি" নামক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কেন ইহাকে বাঙ্গলায় অনুভূতিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে এবং কেন Classical Poetry কে আদর্শ প্রধান বলা উচিত।

কবির আদর্শ কত উচ্চ ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা অথবা সমালোচনার উত্তেজনা প্রায়শঃই নিরর্থক কারণ আদর্শের উচ্চতা সব সময়েই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক নহে। আদর্শ-হিসাবে রামায়ণ—'ওডেসি' অপেক্ষা বহু উচ্চ মনে করিলেও বাল্মিকী হোমার হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় না কিম্বা কেবল আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া রবীন্দ্রনাথকে মাইকেল হইতে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। একদিকে যেমন উদ্দেশ্যবিহীন কবিতা শুধু কল্পনার খেয়াল,—পাগলের প্রলাপোক্তির মত বোধ হয় আর একদিকে তেমনই আদর্শকেই এক মাত্র মাপকাঠি ধরিয়া কাব্যের বিচার করিলে তাহাকে নীতি শাস্ত্রের সহিত একত্র করিয়া দেখিতে হয়। প্রকৃত কাব্য-সৃষ্টিতে একটী নির্লিপ্তভাব আছে,—ইহাতে ভোগ বিরতিরও আভাষ পাওয়া যায়। জ্ঞান ও চেতনার সংঘাতে কবির মনে যে অনুভূতি প্রজ্বলিত হয়, তাহার উপর তাঁহার যেন কোনও হাত নাই; সে নিজের ইন্ধন নিজেই জোগাড় করিয়া লয়। অধ্যাত্মসত্তার গভীরতার মধ্যে ভাষা ও ভাব তাহার সহিত আপনিই যুক্ত হয়। একটী কণাকে কেন্দ্র করিয়া স্ফটিক যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে গড়িয়া উঠে, তেমনই করিয়া সেই—অনুভূতির চতুর্দ্দিকে ভাব-সম্পদ সৃষ্ট হয়। সত্য ও সৌন্দর্য্যকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জ্ঞানের দ্বারা জমাট করিলে কাব্য রচিত হয় না।

আমার মনে হয় এই জন্য রবীন্দ্রনাথের আজিকালিকার কবিতায় জীবনী-শক্তির হ্রাস উপলব্ধি হইতেছে। যে প্রাণের বেগে, অনুভূতির খরস্রোতে একদিন তাঁহার কবিতা উথলিয়া উঠিয়া "আকুল পাগল পারা" জগৎ প্লাবিত করিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহার যেন আর সে শক্তি নাই,—এখন তাহার সার্থকতা জ্ঞানে ও তত্ত্বে। যেখানে তাঁহার কাব্যের মূলে অনুভূতি বিদ্যমান, সেখানে ভাষা ও কল্পনার সামঞ্জস্য, ভাব-ব্যঞ্জনার স্বাভাবিকত্ব একটী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা সমস্ত অস্পষ্টতা ও চাঞ্চল্য সংযত করিয়া তাঁহার কবিতাকে একটী দিব্যশ্রী প্রদান করিয়াছে। কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভা মুখ্যতঃ অনুভূতিমূলক এবং তাঁহার কাব্যের ভাব ও ভাষা, রচনা-ভঙ্গী বা প্রকাশ-প্রণালী অনুভূতি-ব্যঞ্জক, অর্থাৎ অনুভূতির ধারা অনুসরণ করিয়া ইহারা স্বভাবতঃই স্ফূরিত হইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি তাহা না বুঝিয়া জ্ঞানের কথা, দর্শন-তত্ত্ব সেই একই প্রণালীতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন; একথা ভুলিয়া যান যে জ্ঞানের প্রকৃতিই এই, যে ইহাকে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিতে হয়;—ইহা মুক্তির কার্য্য কারণ পরম্পরার অপেক্ষা রাখে,—জ্ঞানকে কল্পনার আব্‌ছায়ায়

ফেলিলে অথবা রূপকের অস্পষ্টতায় ঘেরিলে তাহা অনুভূতিতে পরিণত হয় না,—তখন তাঁহার রচনাতে দুইটী পরস্পর-বিরোধী ভাবের উৎপত্তি হইয়া এমন একটী অস্বাভাবিকত্ব আসিয়া পড়ে যে পাঠকের মন স্বতঃই তাহা হইতে প্রত্যাকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলে যেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠে এবং সহজেই বোধগম্য, মূলে তাহাদিগকে তেমন স্পষ্ট ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভাব ও ভাষার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য অনুবাদে অনেকটা ঢাকা পড়ে। কিন্তু তাঁহার অনুভূতিমূলক কবিতাগুলি অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইলে, তাহাদের প্রায় সমস্ত সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়, মূল ভাবটীর ছায়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে,—জ্ঞানের কথা যত সহজে অনূদিত হইতে পারে, অনুভূতির কথা তত সহজে হয় না।

ভাবের সৌন্দর্য্য, প্রকাশের স্বাভাবিকত্বের উপর নির্ভর করে। এবং আমাদের দেশের অবস্থাই এমন যে আমাদের সাহিত্য-রচনার মধ্যে স্বতঃই যেন একটী প্রকাশের বিকৃতি আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই যদিও মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ তাহা হইলেও এই প্রকাশের রীতি বহুল পরিমাণে পাঠক সমাজের রুচি ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লেখক যে শুধু নিজের অন্তর্গূঢ় আনন্দের প্রাচুর্য্য হইতেই লিখেন তাহা নহে,—তাঁহাকে অনবরতই এইটী কাল্পনিক পাঠককে তাহার মনের সম্মুখে শ্রোতা ও বিচারকরূপে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। সাহিত্য রচনা একাধারে সৃষ্টি ও সমালোচনা। সাহিত্যিক স্রষ্টাও বটে, সমালোচকও বটে, যে অনুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হ'ন,—ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহাকেই আবার বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার কল্পিত পাঠকের রুচি ও আদর্শ অনুসারে একটু ভিন্ন আকারে গড়িয়া তুলিতে হয়। কবির অনুভূতির সম্পূর্ণতা কখনই কাব্যে প্রতিফলিত হইতে পারে না। সাহিত্যে আমরা যাহা পাই তাহার সমস্তটাই লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নহে। কালের গতি দুই দিক দিয়া লেখককে চালিত করে। একদিকে যেমন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ এই গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আর একদিকে তেমনই এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে তাঁহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, রুচি ও অবস্থা একটী বিশেষ রীতির মধ্যে আনিয়া ফেলে। যেখানে এই দুইটীর মধ্যে যত সামঞ্জস্য আছে, সেখানে লেখকের রচনা তত স্বাভাবিক ;—ততই আমাদের মনে হয় যেন স্বয়ং কাল লেখকের হইয়া তাঁহার

লেখনী চালনা করিয়াছেন ; সাহিত্যের কথা কালের স্বাক্ষী-রূপ হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্য এক এক যুগের সাহিত্য এক একটী বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং কালের গতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাহিত্যকে ঠিক বুঝা যায় না। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশৃঙ্খলতা ও অনেক সময়েই যে প্রকাশের বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহার একটী কারণ এই যে, লেখকের নিকট এখন পর্য্যন্ত সেই কল্পিত পাঠকের মূর্ত্তিটী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পাঠকের রুচি ও আদর্শ কি ? প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে আমাদের দেশে কোনও নূতন সভ্যতা অথবা আদর্শের সূচনা সর্ব্বজন সমাজে এখন পর্য্যন্ত সংক্রমিত হয় নাই।

সমগ্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা দীক্ষা অথবা চিন্তা প্রণালী যদি এক না হয়,—সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও আদর্শ প্রবর্ত্তিত থাকে,—তাহা হইলে সাহিত্য-রচনা সহজ স্বাভাবিক ও সরল হইতে পারে না। আবার ইহার উপর যদি লেখকের মনের অন্তরতম প্রদেশে জাতীয় জীবনের গৌরব-বোধ অথবা অতীতের প্রতি সভক্তি প্রণতি না থাকে,—যদি জীবনের দৈন্য তাঁহাকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলে যে তিনি নিজের মধ্যে নিজে সোয়াস্তি না পান,—তাঁহাকে অনবরতই অন্য দেশের সাহিত্য ও সভ্যতাকে বড় করিয়া দেখিতে হয়,—তাহা হইলে সেই কল্পিত পাঠক লেখকের মনের অগোচরে বিদেশী সমালোচকে পরিণত হইয়া যায়,—তখন তিনি বুঝিতে পারেন না ভিতরকার যে সূত্রটী তাঁহার সাহিত্য-চেষ্টা সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে,—তখন সে সাহিত্য কেন্দ্রভ্রষ্ট, অসংযত ও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। এইরূপ সাহিত্য যে সবসময়েই বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ প্রয়াস-লব্ধ তাহা নহে, বরং ইহা তাহার উল্টাও হইতে পারে। ইহার মধ্যে কেমন যেন একটু উৎকট দেশীয়তার ভান আসিয়া পড়ে—দেশীয় বিশিষ্টতাগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া, সংযমের সীমা ছাড়াইয়া, ভণ্ডতাপসের রূপে বিদেশীর নিকট প্রতিভাত হইতে চায়, এইরূপ সাহিত্য ও শিল্পে সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না কারণ ইহা অন্তরের সরল অভিব্যক্তি নহে। এবং এই ভাবটী আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে ও শিল্পে যে দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের বিশিষ্টতা, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিদেশীর নিকট ফলাইবার একটী উগ্র আকাঙ্ক্ষা, একটু অভিনয়-প্রয়াস ইহাতে লক্ষিত হয়। যে অভিনব বেশে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে দেখা দিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার

আধুনিক সাহিত্যেরই প্রতিকৃতি। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যে তাঁহাকে মরমী কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—সেই গৌরবেই তাঁহার আত্ম-গৌরব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। নিজের উপর অবিশ্বাস, আত্মার প্রতি উপেক্ষা সাহিত্যের কল্যাণকর হইতে পারে না। কিপলিং, মেটারলিঙ্ক্, অথবা টুরগেনেভের সমকক্ষ হইলেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সার্থকতা হয় না, তিনি যে আমাদের অনেকের কাছেই নোবেল প্রাইজের বহু উর্দ্ধে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি তিনি অন্তরের সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া চির-মহিমান্বিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জগতের নিকট যাইতে হইবে না, জগৎ আপনিই তাঁহার নিকটে আসিবে। সাধারণ লোকের পক্ষে না হউক, কবির পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ—তাঁহার গৌরব মুখ্যতঃ স্বদেশে, বিদেশে নহে। অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের আজি কালিকার রচনায় 'রস' পাওয়া যায় না। এ গুলিতে সত্যের গভীরতা আছে, কল্পনার কমনীয়তাও যে নাই তাহা নহে, কিন্তু ভাবের গতি নাই। তিনি সত্যের হেঁয়ালি রচনা করিতেছেন,—রূপকের সাজ পরাইয়া দিতেছেন,—অধ্যাত্মজীবনের মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। তাঁহার সাহিত্য-জীবনে যেন পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িয়াছে—নৈতিক ও মানসিক আড়ষ্টতা কাটাইয়া ভাবের যুক্ত প্রবাহে তিনি নিজেকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছেন না। যাঁহার অনুভূতি একদিন শুক্লসন্ধ্যার সৌন্দর্য্যে অশ্রুবিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল, গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্য সাক্ষী করিয়া যিনি তাঁহার প্রাণ প্রকৃতিকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, কত জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা ভাষায় গুঞ্জরিয়া উঠিয়া তাঁহার জীবন-কুঞ্জ এক অজানিত রাগিনীতে ভরিয়া দিয়াছিল, সাগরের খোলা হাওয়া বহিয়াছিল,—আজ তাঁহাকে কিনা অধ্যাত্ম কবিতার অলীক মোহে মুগ্ধ হইয়া, বিদেশী পাঠকের সাময়িক চিত্তাকর্ষণের জন্য, বৈষ্ণব-কবিতার বিকৃত অনুকরণে অথবা মেটারলিঙ্কের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

যেদিন হইতে তিনি পশ্চিমে সমাদৃত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার কবিত্বের উৎস শুকাইয়া আসিতেছে। অনুবাদে যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। জ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাণের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার এখন কার কবিতাগুলি যত সহজে অনুবাদ করা চলে, আগেকার কবিতা তত সহজে অনুবাদ করা যায় না; কারণ সে গুলিতে ভাষা ও ভাবের সহিত প্রাণের যোগ আছে। বাস্তবিক

তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতা দিয়া পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত হয়েন নাই। যে সব কবিতায় পাশ্চাত্য ভাবেরই প্রতিধ্বনি, অথবা যাহাতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার একটা বিকৃতি দেখা যায়,—সে গুলিই—সেখানে সমধিক প্রশংসিত হইয়াছে। যাঁহার অপূর্ব্ব অনুভূতি একদিন তাঁহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে লইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মানস-প্রতিমা নিত্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া অন্তরের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া দিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রতিভা আত্ম-বিস্মৃত এবং পাশ্চাত্যাভিমুখে ধাবিত! আমাদের জাতীয় জীবনের এমনই অভিসম্পাত যে বর্ত্তমানের পাওয়ানাটুকু চুকাইয়া লইতে গেলেই ভবিষ্যৎকে হারাইয়া বসিতে হয়! আমরা এখন যাহা দিয়া আমাদের প্রতিভার নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি কালের সাক্ষী হয়ত তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিবে! পরের মুখের দিকে তাকাইয়া সাহিত্য-রচনা হয় না, কারণ ইহা অনুভূতির কথা, মরমের ব্যথা। সাগরের পরপারে যে সুদূরের সভ্যতা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, আমাদের কণ্ঠস্বর তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই স্বাভাবিকত্ব হারাইয়া ফেলে। কারণ সাহিত্য আমাদের অন্তরতম সত্য, ইহাতে মৌলিকতা থাকিলে, ইহার স্বদেশে প্রতিষ্ঠাই সময়-সাপেক্ষ, বহুকাল চর্চ্চার পরে ইহার বিদেশে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে হইলে চাই জ্ঞানের স্বচ্ছ দৃষ্টি, অধ্যাত্মচেতনার মেঘমুক্ত জ্যোতিঃ যাহাতে হৃদয়ে সমস্ত সত্য প্রতিভাত হইয়া ত্রিকোণাশ্রিত স্ফটিকের মধ্যে সূর্য্যরশ্মির মত বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় জগতের মন মোহিত করিতে পারে। সত্যানুভূতি যত বাড়িতে থাকে, আমাদের সমস্ত সত্তা স্পন্দিত করিয়া সাহিত্যও তত শব্দে ধ্বনিতে রণিত হইয়া, হৃদয়ের উচ্চস্বরগ্রামে প্রাণের মুক্ত মূর্চ্ছনায় মিলাইয়া যায়। তাই অনুভূতি ও ছন্দে ধর্ম্মে ও সঙ্গীতে সাহিত্যের উৎপত্তি। যে ওঙ্কারধ্বনি ভারতে একদিন উঠিয়াছিল, তাহা যেন এক বিরাট সত্যানুভূতির নির্ব্বাক স্পন্দন,—সাহিত্যের অন্তররূপ!

প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সাহিত্যের চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সহিত যেন একটু অন্তরের যোগ আছে এবং ইহা একাধারে এই দুইটীর যত কাছে যাইতে পারে ততই উৎকর্ষলাভ করে। সাহিত্যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়া শব্দের সাহায্যে তাহাকে রূপে ফলাইবার চেষ্টা করা হয় এবং সে বিষয়ে ইহা চিত্রকলার অনুরূপ। এই রূপ-মাধুর্য্য সাহিত্যে যত থাকে তত তাহার চমৎকারিত্ব। আবার অপর পক্ষে সত্যানুভূতির গভীরতার দরুণ প্রাণের যে আবেগ,—ভাবের এই গতিকে ভাষার ঝঙ্কারে পরিণত করাও সাহিত্যের

একটী অংশ এ বিষয়ে ইহা সঙ্গীতেরই অনুরূপ জ্ঞান, চিত্রকলা ও সঙ্গীত, এই তিনের পবিত্র সঙ্গমই সাহিত্যের পুণ্যতীর্থ। এই তীর্থোদকে স্নাত হইলে সাহিত্যের যে নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে, তাহা যেন এক অব্যক্ত আদর্শের জ্যোতি সূচিত করে,—কোন দূর স্বর্গের আভাষে হৃদয়ে পুলক সঞ্চার হয়। একদিকে যেমন অমূর্ত্ত সত্যকে শব্দ-বিন্যাসে রূপে ফলাইতে হয়, মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত করিতে হয়, আর একদিকে তেমনই ভাষার ইঙ্গিতে ও ঝঙ্কারে সেইরূপকে লয় করিয়া প্রাণের আবেগে পরিণত করিতে হয়।

এইজন্য কোনও বিদেশীয় সাহিত্যের শিল্পহিসাবে চর্চ্চা এত কঠিন। বহুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্য আমাদের দেশে অধীত হইতেছে কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ সাহিত্যকে আমরা রূপ দিতে না পারি, অথবা ইহাকে সঙ্গীতে, নাট্যে উপভোগ করা আমাদের পক্ষে যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এ সাহিত্যের ভিতরকার সঙ্গতি, অন্তরের স্বরূপ আমাদিগের নিকট সম্যক স্ফুট হইবে না, ইহা কেবল শুষ্কজ্ঞান রহিয়া যাইবে, আমাদের চিত্তকে সরস করিবে না। আমরা ইংরাজী কবিতা পড়ি এবং মনে করি বুঝি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা দিয়া কবিত্বের মাধুর্য্য ধরা যায়। মিল্টনের কাব্য আমাদের নিকট বক্তৃতা, শেলীর সঙ্গীতের বিগলিত ধারা আমাদের নিকট শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা। ইংরাজী সাহিত্য পড়িবার সময় ভাবের সঙ্গে সঙ্গীতের ও রূপের যে সূক্ষ্ম যোগ আছে তাহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। বিদেশী রচনার উৎকর্ষ বুঝিতে গিয়া আমরা সমালোচকের গবেষণায় ব্যথিত হইয়া পড়ি, কারণ ভাষার যে অনুভূতি লইয়া সাহিত্য-সমালোচনা হইয়া থাকে, যে ভাব ও ছন্দোমাধুর্য্য ইহার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সংলিপ্ত, ইংরাজী ভাষার সেই অনুভূতি আমাদের অনেকেরই হয় না। এ ঠিক সাহিত্য-চর্চ্চা নহে, সাহিত্যের শরীর-বিজ্ঞানের চর্চ্চা। সেইজন্য আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা এতই হাস্যাস্পদ ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত! ইংরাজী সাহিত্যের যে সমালোচনা বাঙ্গালীর নিকট হইতে বাহির হয় তাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনও প্রকাশ নাই, কতকগুলি পাশ্চাত্য সমালোচকের মতামত একত্রিত করিয়া আমরা আমাদের কৃতিত্ব জাহির করি। এইরূপ বিদ্যায় কি কেহ মানুষ হইতে পারে? ভাষা ত আমাদের পোষাক নহে,—যেমন ইচ্ছা ছাঁটিয়া লইব, যখন ইচ্ছা ছাড়িয়া দিব,—ইহা যে মানব-মনের, সমস্ত অধ্যাত্মজীবনের দেহ,—রূপে অভিব্যক্তি। ইহার

ভিতরে যে প্রাণ, সেই প্রাণ যিনি ধরিতে না পারিয়াছেন, ইহার বাহিরে যে সত্য, সেই সত্যও তাঁহার নিকট পরিস্ফুট হইবে না,—এ কেবল ছায়াকে কায়া বলিয়া উপলব্ধি করিবার নিষ্ফল প্রয়াস!

ভাষার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, বর্ণনার চমৎকারিত্ব, এবং শব্দের রণন মধুর মন্দ্রে ধ্বনিত করিবার শক্তি বাঙ্গলায় মাইকেলের যত আছে, বোধ হয় আর কাহারও তত নাই। মাইকেল কল্পনাকেই আবাহন করিয়াছিলেন, এবং কল্পনাদেবী তাঁহাকে আপন বরপুত্র করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক কবিতায় যেন কেবল স্বপন বাতাসে বপন করিয়াছেন, তাঁহার বাসনা-বাঁধনে কিছুই ধরা পড়িতে চাহেনা;—তিনি এতই আবেগভরে প্রাণপণে ঝঙ্কার দেন যে তাঁহার বীণার তার বুঝি ছিঁড়িয়া যায়, তাঁহার আশার তরণী যেন কূল পায় না—রূপ অরূপের মধ্যে ডুবিয়া যায়। আর মাইকেল যখন একবার অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিয়া ফেলেন তখন সেইরূপের দিকটাই বিশিষ্ট করিয়া ফুটাইতে চান্, তাহাকে স্ফুটতর করিয়া কত ভাবেই যে দেখেন বলা যায় না। কিন্তু ভাষার যে ইঙ্গিতে ও ঝঙ্কারে রূপের সৌন্দর্য্যকে কেবল ক্ষণিকের প্রকাশ বলিয়া বোধ হয়,—সমস্তরূপের পশ্চাতে ভাবের যে গভীর ব্যাপ্তি,—তাহা বড় অনুভব করিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ যে কি, মানুষ তাহা বুঝে না, বিশ্লেষণে তাহা দেখান যায় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আত্মানুভূতি থাকিবে, ততদিন আমরা সৌন্দর্য্যের ভিতরে একটা ভাবের আভাস্,—সত্যের একটা নির্ম্মল ভাতি,—সন্ধান করিয়া ফিরিব,—শুধু বাহ্যপ্রকাশ লইয়া আমাদের আত্মার তুষ্টি হইতে পারে না। মাইকেল এই বাহ্যপ্রকাশেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন,—কোনও নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে যান নাই। বাল্মিকী কিম্বা হয়ত মিল্টনের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন,—তাহাকে রূপে ধরিতে তাঁহার এতই উল্লাস, যে সেই মাদকতায়, রূপের সেই মোহে,—তাঁহার অধ্যাত্মচেতনা সম্যক জাগ্রত হয় নাই। মাইকেলের কল্পনাশক্তি, তাঁহার ভাষা কখনও মধুর কখনও গম্ভীর, তাঁহার চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা, দুকূল প্লাবিনী বর্ণনা,—এ সমস্ত বিষয়েই মেঘনাদবধ বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়; এবং তাহার গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালই ধ্বনিত হইবে। কিন্তু মাইকেলের কার্পণ্য তখনই অনুভূত হয়, যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি,—এ সব কিসের জন্য? এই যে রণসজ্জার দুন্দুভিনাদ,—কালমেঘাবৃত অম্বরে বিজুলীচমকের মত বীরাঙ্গনার এই যে রুদ্রমূর্ত্তি এই যে সীতা-সরমার

করুণ কাহিনী,—দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র-সৈকতে মেঘনাদের অন্তিম শয্যার হৃদয়াবরুদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস,—একি কেবল কল্পনার মায়ামরীচিকা? কোনও গভীর সত্যের মধ্যে যদি সৌন্দর্য্যের প্রকাশ না হয়, কবি যদি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-বোধ লইয়া ঋষিপদ-বাচ্য না হইতে পারেন, তবে তাঁহার কবিতার সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যেরই এমন একটা মহীয়সী শক্তি আছে যে সে অজ্ঞাত স্বর্গের রাগে হৃদয় রাঙিয়া তুলে, মনের গুপ্তকোণে অশ্রুত দৈববাণী ভাষায় গুঞ্জরিয়া উঠে;—কিন্তু যে আভাসে ও ইঙ্গিতে, যে শিশির-স্নাত অমল শোভায় হৃদয় পুলকিত করে,—তাহা যেন জ্যোৎস্নার আধআলো জাগরণ, সত্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ তাহাতে না পড়িলে তাহার স্বরূপ প্রাণে পরিস্ফুট হয় না। ভাব ও সৌন্দর্য্য সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে স্বপ্নলোকের সত্তাহীন মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না—ইন্দ্রিয়ের পুলকে প্রাণে দাগ পড়ে না।

গোপন কথা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

কইব ভাবি কতই কথা, কাছে পেয়ে ব'ল্‌তে নারি কিছু,
কেঁদে মরি চোখের আড়াল হ'লে,
চাইতে গিয়ে মুখের পানে, হ'য়ে আসে নয়ন দুটি নীচু,—
কঠিন মোরে ভাবিস্‌নি তা ব'লে;
সুধান যবে হাতটি ধরে, 'মনোমত নইকি তোমার আমি,
যোগ্য তোমার নই কি আমি মোটে?'
সরম ধরে অধর চেপে, হয় না বলা 'আমি তোমার, স্বামি'!
নীরবে প্রাণ চরণ-তলে লোটে।
জানিস্ তোরা যতই রাগি, যতই করি ভারি গলার স্বর,
সবি আমার লোক-দেখানো—ছল,
নয়তো তাঁরে তোরা যখন ডাকিস্ ব'লে 'ওগো, দিদির বর'
হৃদয় বলে 'আবার ফিরে বল্';

দিসনিক' ভাই আড়ি ক'রে, কপট কোপের করি বলে ভান,
তোদের কাছে নেইত কিছু ছাপা,
চতুরতায় যায় কি প্রাণের লুকিয়ে রাখা সবার বড় দান,
স্নেহের কাছে প্রেম কি থাকে চাপা?

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তিন বন্ধুতে আবার আলাপ আরম্ভ করিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল?'

প। আইন-ভঙ্গ করছেন! 'আপনাদের' না 'তোমাদের'? আলাপ হচ্ছিল গাঁয়ের প্রজাদের দুর্দ্দশা—জমীদারদের কর্ম্মচারীদের উৎপীড়ন বিনি খরচায় বিনি ক্লেশে গরীবের দুঃখ দুর করছিলাম আমরা অন্ততঃ আমি ভবানী সত্যই একটা হাতে কলমে কাজ করেছে—কি জান? ওদের মাছমারী মহালে এক গুণধর নায়েব—কি নামহে ভবানী? পতিতপাবন, হ্যাঁ ইনি খুব প্রবল প্রতাপে প্রভুর কাজ করছিলেন—দুচার ঘর প্রজার বাসোচ্ছেদ গৃহদাহ প্রভৃতি কাজে তাঁর প্রতাপের মাত্রা এতই বেড়ে ওঠে যে ভবানী বলে কয়ে খুড়োকে দিয়ে তার জবাব করে দিয়েছে নতুন এক নায়েব আসছে—এসেছে না হে?

ভ। আজকাল মধ্যেই আসবে—

প। ইনি আবার কেমন হবেন তা জানিনি! তুমি তাকে চেন?

ভ। শুনিছি খুব দক্ষ,তবে কিসে দক্ষ কাজে কলমে দেখলে বোঝা যাবে—

যাত্রী মহোদয় ওরফে এই নূতন নায়েব বাবু ক্রমশঃই হিমাঙ্গ হইতেছিলেন। বিবর্ণমুখ খানা ব্যাচারী জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে ধানের ক্ষেত ও নীল আকাশের দিকে ঘুরাইয়া রাখিল। কলিকার আগুন কলিকায় নিবিয়া গেল।

প। দেখ ভবানী তুমি এবার হতে মাঝে মাঝে incognito হয়ে মহালে বেড়াতে যেও বাস্তবিক তোমারও তো ভাই কর্ত্তব্য সেটা—

ভ। নিশ্চয়! তবে কি জান—থাক্ সে কথা—

গাড়ী যাত্রীপুঙ্গবের গন্তব্য ষ্টেশনে আসিল। ব্যাচারী তাড়াতাড়ি বোঁচকাবুচকি লইয়া নামিতে ব্যস্ত হইল। বন্ধুরা ধরাধরি করিয়া জিনিষ গুলা নামাইয়া দিল। পঞ্চু বলিল "মহাশয় আবার আসছেন কবে?

নায়েব বাবু উত্তর না দিয়া ভিঁড়ে মিশিয়া গেলেন। ঘামদিয়া তার জ্বর ছাড়িল কিন্তু দুর্ভাবনার ভূত ছাড়িল না। যাত্রা করিবার সময় কাছারী বাড়ীর চালে টীক্‌টীকি ডাকিয়াছিল ও বুড়া গোমস্তা হাঁচিয়াছিল সেটা তার মনে পড়িল।

ভ। (বিজয়কে) আপনি ক'দিন দেশে থাকবেন?

বি। হয় দুদিন; না হলে একেবারেই থেকে যাব—

ভ। তার মানে?

বি। একটা কারণ ঘটেছে, মোট কথা হয়তো চাকরী করবো না—দেশে চাষ বাস করলে কেমন হয়?

প। অনভ্যাসের ফোটা হলে কপাল চড়্ চড়্ করবে—

বি। চেষ্টা করা মন্দ কি? অভ্যাস হতে কতক্ষণ?

প। চাষ করতে হলে ভিতরে বাইরে চাষা হতে হবে। চাষা মানে uncultured boor নয় কৃষক কৃষিজীবি—

বি। বাঙ্গালী মধ্যবিৎরা তো হাজার বছরের চাষী; দুপুরুষেই না হয় চাকরে বাবু হয়েছে—চাষী বলতে আমি বলছি genlteman farmer নয় কি ভবানী বাবু?

ভ। বটেই তো—?

পঞ্চু হঠাৎ সুর সহকারে গান হাকিল:—

আদম যখন ঠেলতো লাঙ্গল ইড্ ঘোরাতো চরকা
বংশ গুমর যার যা যত ঐ খানেতেই ফাঁকা
বাবা ঐ খানেতেই ফাঁকা—

বি। বাঃ পঞ্চু বাবু আপনার খাসা গলাতো?

প। গদলী বল-সাধু ভাষা বলবে।

ভ। গদলী কি?

প। কলা যদি কদলী হয় তবে গলা কেন গদলী হবে না?

বন্ধুরা এমনি করিয়া হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইতে লাগিল। গাড়ী আসিয়া হরিপালে থামিল। বন্ধুরা নামিয়া গেলেন। বুড়ী ও তার

নাৎনিটীকে বিজয় সাবধানে নামাইয়া দিল। টীকিট দেবার সময় ভবানী ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া বুড়ীর ও তার নাৎনির উপরি দেনা ভাড়া মিটাইয়া দিতে গেল। ষ্টেশন মাষ্টার ভবানীকে চিনিত। সম্ভ্রমের সহিত বলিল "না না ও কেন? এমন কত যাচ্ছে, আস্‌ছে—যেতে দেন।"

ভ। না মাষ্টার মশাই—তা হয় না; একটা পয়সায় আমি গরীব হয়ে যাব না, আর রেলকোম্পাণী যে বড় লোক হয়ে যাবে তাও হবে না। তবে কথা হচ্চে যে আইন বাঁচিয়ে চললে—

প। সব দিক রক্ষা হয়—এস এখন।

মাষ্টার মহাশয় অগত্যা একটা রসিদ দিয়া এক্‌সেস্ ভাড়া লইলেন।

ভবানীর জন্য পালকী ও লোকজন লইয়া নিবারণ বক্সী নামে একজন কর্ম্মচারী ষ্টেশনে হাজির ছিল। ভবানী পালকীতে উঠিল না, পঞ্চুর দিকে তাকাইয়া বলিল "এই তো ক্রোশ দেড়েক—চল তিন জনে হেঁটে যাই কি বল—বিজয় বাবু?

বি। আমাদের তো অপ্‌সন নাই যেতে হবেই—আপনি পারবেন? (হাসিয়া)

ভ। কেন আমি কি কোমলাঙ্গিনী পর্দানশিনী? বড় লোকের বাড়ীর ছেলে হওয়া কি হাঙ্গাম! তারা যে-না লোকের দোষ নেই—চলুন বেশ খোলামাঠ পাকা ধানের গন্ধ আস্‌ছে—হু হু বাতাস, বাঃ কি সুন্দর!

এই বলিয়া তিন বন্ধু মাথায় চাদর জড়াইয়া চলিতে উপক্রম করিবেন, এমন সময় নিবারণ বক্সী হুজুরের কোমলপদ পল্লবের ভবিষ্য অবস্থা কল্পনা করিয়া সভয় সকাতর কণ্ঠে বলিল:—

"আপনি কেন হেঁটে যাবেন? পাল্কী তো আছে বৌ রাণী মা (নয়নতারা) আমায় বকবেন যে?—"

ভ। না বকবেন না আমি হেঁটেই যাব, তোমরা দয়াময়ীর বাজারে গিয়ে অপেক্ষা কর না পারি তখন পাল্কীতে চাপবো—

নিবারণ অগত্যা কিছু কিছু পাল্কী লইয়া চলিল। তিন বন্ধু মাঠে গিয়া পড়িল। ধান জমির আল ভাঙ্গিয়া কিছু কিছু চলিতে লাগিল। ভবানী কথা পাড়িল—

কলকাতার ধোঁয়া-ধুলো ভরা বাতাসে আর গ্রামের এই তরতরে হালকা বাতাসে কত তফাৎ তা নিশ্বাস টেনেই বোঝা যাচ্ছে নয় কি?

বি। তা আর বলতে? কিছু দিন থাকলেই বেশ বোঝা যায় যে—

প। পিলে লিভারের সঙ্গে পল্লী বাতাসের কি নিবিড় ঘনিষ্ট আত্মীয়তা! বিজয় ও ভবানী খুব হাসিয়া উঠিল।

ভ। কবি যখন গান তৈরি কল্লেন—

পল্লী আমার জননী আমার! আমার জন্ম-জন্মের দেশ!

প। একি মা তোমার মলিন বসন পিঁচুটী নয়ন রুক্ষ কেশ?

ভ। পঞ্চুর মত কুসন্তান আর দুটী নাই নিজের দেশ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ! আচ্ছা, কবি ও কথা লিখে কি অতি স্তুতি করেছেন বল্‌তে চাও?

প। যে কবি লিখেছিলেন তিনি কখনো পাড়া গাঁয়ে পা দেন নি আর তিনি কলকেতার তেতালার ছাতে বিলাতী ফুলের টবের পাশে বসে চাঁদনি রাতে ওটী লিখেছিলেন—তিনি মিছে কথা লিখেছেন—দাদা যে থাকে সম্বৎসর পাড়া গাঁয়ে—

ভ। আমিতো ছিলাম—

প। তোমার কথা ছেড়ে দাও নবনী ভোজন করে ফুলেল তেল মেখে দুগ্ধফেন বিছানায় শুয়ে রুইমাছের মস্তকভোজন করে অমনি থাকতে পারে তো? তা ক'জন পারে? যাচ্ছ তো বিজয় বাবু দেখবে, এইতো মড়কেশ্বরী দেবীর busy season ঘরে কেমন উৎসব লেগে গেছে! সে কালের গল্পে শোনা যায় রাজা মাত্রেরই একটী ছদ্মবেশ ধরা রাক্ষসী রাণী থাকতো। সে দিনে মনমোহিনী রাত এলেই হাতীশালের হাতি ঘোড়া সালের ঘোড়া খেতো। এই ম্যালেরিয়াটী আমাদের সেই রকমের রাক্ষসী রাণী ছমাস দেশের মাটীর ভিতর লুকিয়ে থাকে ছমাস বেরিয়ে এসে চামুণ্ডা বেশে শ্মশান লীলা লাগিয়ে দেয় তখন দেশময় মড়ারই কি একটী নেশা চেগে যায়!—

বলিতে বলিতে পঞ্চুর উজ্জ্বল চোখ দুটা যেন জলে ভরিয়া উঠিল; কণ্ঠস্বর তীব্র হইতে গম্ভীর হইয়া পড়িল। ভবানী ও বিজয় পঞ্চুর কথার সত্যতা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিজয়ের এমন অভিজ্ঞতা নাই তবে কল্পনায় সে সে-চিত্র আঁকিতে পারিল।

পঞ্চু চুপ করিলে, আর কেহ কোনো কথা কহিল না। নিজে নিজে নিজ্ অন্তরের সেই বর্ণনার সত্য ছবি আঁকিতেই ব্যস্ত। অসাবধানে চলিতে চলিতে ভবানীর পা আল হইতে পিছলাইয়া মুচড়াইয়া গেল। পিছনে বিজয় ছিল ধরিয়া না ফেলিলে ভবানী পাশেই সজলধানবনে পড়িয়া যাইত। পঞ্চু বলিল খুব লেগেছে?

ভ। না

প। বলেইছিতো দাদা অনভ্যেসের ফোঁটা! (উচ্চস্বরে) ও বক্‌শী মশাই পাল্কী আন্‌তে বলো।

বক্‌শী ব্যস্ত হইয়া কাহারদের ডাক দিয়া পাল্কী আনিতে হুকুম করিল। নিরুটে একটা বট গাছ তলায় পঞ্চু ভবানীকে বসাইয়া তার পায়ের সেবা আরম্ভ করিল। ভবানীর বড় লজ্জা হইল। আধ ক্রোশ না আসিতে আসিতে এমন রসভঙ্গ হইবে সে ভাবে নাই। বাধ্য হইয়া সে পাল্কীতে চাপিয়া আগে যাইতে বাধ্য হইল! ভবানী পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল "একেবারে গিয়ে নেউগী ঘাটে নাম্‌বো, তোমরা সেই খেনে এস—"।

বিজয় ও পঞ্চু সরকারী সড়কে উঠিল। মাটীর রাস্তা খুব চওড়া। গরুর গাড়ীর যাতায়াতে স্থানে স্থানে চাকার চাপে কাটিয়া গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। দুধারে ধানের ক্ষেত, যতদূর চোখ যায় ততদূর, কাঁচাপাকা ধানেভরা। তারি বুকে দূরে কাছে ছায়াশীতল বনবেষ্টিত ছোট ছোট গ্রামগুলি সমুদ্রের উপর ছড়ানো দ্বীপখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। দুইবন্ধুতে কথা চলিল।

প। ব্যাচারী বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে—

বি। লেগেওছে খুব বোধ হয়?

প। সভ্যমানুষের কিন্তু লাগার চেয়ে লজ্জাটাই বেশী কষ্ট কর—

বি। জমীদারের ছেলের মত তো চাল চলন নয়?

প। এইটেই আমাদের এখন পরম সান্ত্বনা ও আশ্বাসের কথা।

বি। কেন?

প। জনের পর রিচার্ড-রাজত্ব যে জন্যে কামনা করেছিল লোকে—

বি। আপনার সঙ্গে আলাপ হলো, কিন্তু কেউ যদি আপনার পরিচয় আমার কাছে চায় তা দিতে পারব না—আমি কি অজ্ঞ! সহরে আজন্ম বাস করে কুনো হয়ে গিইছি। দেশের এমন সব রত্নদের পরিচয় জানিনি! সত্যি বড় লজ্জার কথা—

প। (হাসিয়া) খুব জহুরী তো আপনি। আমি যে রত্ন তা জেনে ফেলেছেন? তবে পরিচয় শুনুন;—"আমি শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা, পিতা ঈশ্বর গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উপস্থিত নিবাস চেতলা গ্রামে মাতুলালয়ে; মাতুল শ্রীহরকালী তর্কসিদ্ধান্ত, ভিক্টোরিয়া টোলের ন্যায়ের অধ্যাপক। মদীয় জননী দেবী জীবিতা। শর্ম্মা দেশের টোলে প্রায় অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির

সঙ্গে কুস্তি কসরৎ করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কৈশোরে রাজধানীতে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করতে আরম্ভ করেন। এখনও তাই চল্‌ছে; সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী বিদ্যাও লাভ হচ্চে। সত্যি ভাই আমার ঝোঁক না হলে আমাকে জন্মটা কালু ব্যাকরণের লোহার কড়াই চিবিয়ে মরতে হতো! খুব বেঁচে গেছি, ভাই—ভাব দেখি একবার, ৮ বছর ধরে 'সহর্ণেঘঃ স্তভিঃতুশ্চ চাকে-টপ্' এই-ই করছি! এদিকে বাঙ্গলায় লিখছি সপরিবার সহ, স্থূশল সংবাদ প্রাপ্তি হইয়া, গঙ্গাস্তীর!—

বি। আপনার মামা বুঝি ইংরাজী পড়ার খুব পক্ষে?

প। খুব! বলেন,—'জ্ঞান আবার দিশি বিলিতি কি? জ্ঞান হাওয়া জলের মত; খাঁটী হলেই হলো; যাতে মানুষের মন বাড়বে, যে জ্ঞানে জীবনে কাজ দেবে তাই অর্জ্জন করতে হবে; তিনি দুঃখ করেন—কতকগুলো বাজে অকেজো কথার চালাকি শিখে জীবনটা নষ্ট করলাম! ছেলে পুলে যেন ও ভুল না করে। তাইতো মশাই বেঁচে গেছি।

বি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের দর্শন ও কাব্য সম্পদ খুবই সুভোগ্য।

প। তা কে ভোগ করতে মানা করেছে? শাঁস খেতে হবে বলে ছাল ছোবড়া চিবোনা থেকে আরম্ভ করতে হবে তার কি কথা আছে?

হঠাৎ উভয়ের কথা থামিল। অদূরে একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে। গাড়ীর চাকা মাটীতে পুঁতিয়া গিয়াছে। গাড়ীতে ধানের বস্তা ঠাসা বোঝাই। একটা গরু নন্‌কোঅপারেশন ব্রত লইয়া জোয়াল হইতে ঘাড় সরাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চাষী গাড়োয়ান বোঝাই বস্তার উচ্চাসন হইতে প্রাণপণে তাহাকে ঠেঙ্গাইতেছে। এবং তাহার জীব-কৌলিন্যের একমাত্র সনাতন চিহ্নস্বরূপ ল্যাজটিতে ঘনঘন নির্ম্মম মোচড় দিয়া চতুষ্পদ ব্যাচারীর উর্দ্ধপুরুষ ও অন্তঃপুরিকাদের সহিত নানারূপ নিকট সম্বন্ধ পাতাইয়া তিরস্কার তাড়না করিতেছে; কিন্তু গো বেচারী প্যাসিভ রেজিষ্টান্‌সের চরম ধৈর্য্য দেখাইয়া বাঙ্গালীকে লজ্জা দিতেছে। সে অনড় এবং অচল।

বন্ধুদ্বয় দূর হইতে অবলাজন্তুর প্রতি এই উৎপীড়ন দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইল। পঞ্চু তাহার বিপুল মাংসল দেহখানা সঞ্চালিত করিয়া প্রথমে গাড়োয়ানকে বলিল—"তুমি কি রকম লোক হে? ব্যাচারীজন্তু পারছে না, আর তুমি তাকে নির্দ্দয়ভাবে মারছ? নিজে চাকা ঠেল না?"

গাড়োয়ান প্রথমটা থতমত খাইয়া কথায় কাণ না দিয়া প্রহার চালাইতে লাগিল। পঞ্চু তার ছড়িটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে টান দিয়া নামাইল; এবং বিজয়কে যোগ দিতে বলিয়া চাকা ঠেলিতে আরম্ভ করিল। দুইজনের সমবেত চেষ্টায় চাকা উঠিল। চাষা তখন গরুকে জোয়ালে ঠিক করিয়া গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। গাড়োয়ান একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিদ্বারা সাহায্যকারী বাবুদের খাতির করিয়া বিনা বাক্যে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দুই জনে দয়াময়ীর বাজার পার হইয়া চলিল। বেলা তখন ১১টা হইবে।

অশ্রু

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

আঁখিবারি,—আঁখিবারি, ওরে আঁখিবারি!—
কেমন লগনে তোরে কি ভাবি বিধাতা রে,
সৃজিয়া সাজায়ে দিল আঁখে সারি সারি!
দুখে সুখে মিশাইয়া
করুণা মাখায়ে দিয়া,
নিভৃতে বসিয়া তোরে শান্তি মাঝে ডারি
গড়েছিল এক মনে ওরে আঁখি-বারি!

ওরে আঁখি-বারি ওরে শান্তির কণিকা,
হৃদিমাঝে চূর্ণকরা দুখ-ধূলিকায়
ঢেলে দিস্ সুশীতল পীযূষ রেণুকা,
উদ্দাম সিন্ধুর প্রায়
হিয়া মাঝে, শান্তি-ছায়
ধৌত করি' রেখে যাস্ দুখ—কুহেলিকা।
ওরে আঁখি-বারি তুই শান্তির কণিকা!

নয়নে উথলি' যাক্ ছল ছল ছলে
হিয়া হ'তে কাড়ি' নিয়া দুখের বীজাণু
গগনে ছড়ায়ে দিস্ পবন হিল্লোলে,
তোহার তরুণ গায়
দুখ যে তরলি' যায়
গলিয়া মিশিয়া তোর তপত পল্বলে
সমাহিত হয় যত দুখের কল্লোলে।

উঠরে ফুটিয়া মোর আঁখি তারকায়
শতে শতে বিন্দু বিন্দু ওরে আঁখি-বারি;
দুখ যে লাগিয়া আছে আমার হিয়ায়
প্রক্ষালি' সে দুখ রাশি
ফুটায়ে শান্তির হাসি
রজনী বিগতে ফুটা স্নিগধ উষায়
ওরে আঁখি-বারি সুখ-রশ্মির রেখায়।

গন্ধ ছুটী বহি মোর ওরে আঁখি-ধারা
মন্দাকিনী-স্রোত সম আয় বেগে নামি'
প্রলেপি হৃদয়ে যত জ্বালা রুদ্ধ-করা।
স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত
প্রীত শীত রুদ্ধ চিত
তোহার প্রভাবে হবে রুদ্ধ হৃদি-কারা।
ওরে ও কল্যাণ-ময় ওরে অশ্রু-ধারা!

জগতজুড়ে ইঙ্গিত

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

আজ কাল মানুষ জড়বাদের মায়া কাটিয়ে উঠে যে এক নতুন সত্যময় জগতের সম্মুখীন, সেকথা নানাদিক দিয়ে প্রকট হয়ে উঠছে। য়ুরোপের জড়বিজ্ঞান এখন শুধু জড় বা শক্তিরই কথা বলে না, আরও অনেক দূর যায়। জগতটা যে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের প্রকাশ, তা' একরকম অভ্রান্ত বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম জগতের অনেক ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষায় লেগেছেন। মানুষ যে জড়ের গণ্ডীতে এতটুকু দীন হয়ে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ভোগের ক্ষুদ্রতায় নিঃশক্তি হয়ে পড়ছিল, এবার বুঝি সে স্রোত ফিরলো। অনন্তের ব্যক্ত স্বরূপের প্রতি পরমাণুটির বুকেও অনন্তই বিরাজিত, পূর্ব্বে যে পূর্ণেই মূর্ত্তিমান তা' একবার বুঝাতে পারলে মানুষের দেবজীবন ফিরে আসবে; তার সভ্যতার ভিত বিশাল সত্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন রূপ নতুন ঋদ্ধি ও বিচিত্রতায় ভরে উঠবে।

য়ুরোপ বাহির থেকে খুঁজে খুঁজে অন্তরের রাজ্যে এগিয়ে চলে; য়ুরোপের মনের গতি—প্রকৃতির ধারাই এই রকম। তাই সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সত্য ধরতে সহজেই তাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সে ভুল অচল হয়ে তাদের জীবন পঙ্গু করতে পারে না, ভুল কেটে যায়, কারণ তাদের জ্ঞানের সংযম ও সত্য পিপাসা Scientific spirit অসীম। যোগ শক্তিতে (spiritüal powers) তারা বহির্ম্মুখী জাতি বলেই বড় দীন, এ শক্তি আমাদের দেশে অনেক আধারে স্বভাবতঃই আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সত্য আবিস্কারের প্রেরণা আমাদের মধ্যে নাই। এই দুইটি একাধারে যার মধ্যে প্রকাশ পাবে সেই মানুষই পরা বিজ্ঞান জগতের সত্যের ছন্দে বাহিরকে বেঁধে দেবে।

ফ্রান্সের (Le Martia) ল মার্তাঁ্যা কাগজে এই সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা হুবহু অনুবাদ করে দিলাম।

"দিনে চল্লিশবার করে বলো, যে আমি সব রকমে ক্রমশঃ ভাল হয়ে যাচ্ছি, তা' হলেই তুমি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হবে।" এই হচ্চে নান্সি সহরের ফরাসী ডাক্তার মুসিয়ে ফুএর শাস্ত্র। এই বিধান অনুসারে সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন। মুশিয়ে ফুএ একজন অদ্ভুত মানুষ; ফ্রান্স, ইংলণ্ড

এমন কি এমেরিকা থেকে যে সব রোগী তাঁর কাছে আসে তাঁদের তিনি চিকিৎসাই মাত্র করেন না, তিনি করেন তার চেয়েও অনেক বড় একটি ব্যাপার; এক মুহুর্ত্তেই তিনি তাদেরই নিজের নিজের রোগের ডাক্তার বানিয়ে ফেলেন। এই সৌম্য শুভ্রকেশ উজ্জ্বলকান্তি বৃদ্ধ তাঁর চিকিৎসা প্রণালী আমাদের কাছে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর আশার অন্ত নাই। "আমি বিশ বৎসর থেকে এই যে auto-suggestion অভ্যাস করছি, এ সত্যটির বল অভাবনীয়। আমি যে ব্যাধি বা পীড়ার চিকিৎসক সে ধারণা তোমরা মনে আদৌ করো না, পীড়ার চিকিৎসক বলে কোন জিনিষই জগতে নেই। লোককে আমি auto-suggestion দিয়ে নিজেই নিজের সব রকম ব্যাধীর চিকিৎসা করতে শেখাই। কিন্তু অনুগ্রহ করে সব কথার গোড়ায় আমাকে একটি বিশেষ সত্যের ওপর তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দাও। লোকে কিন্তু এ সত্য এখনও তেমন স্বীকার করতে চায় না। লোকে যাই-ই বলুক না কেন, ইচ্ছাশক্তি (will power) আমাদের চালায় না, চালায় কল্পনা শক্তি (imagination)। আমাদের মধ্যে দু'টি সত্তা আছে, একটি সচেতন (conscient)—যেটি হচ্ছে আমাদের ইচ্ছাশক্তির নিয়ামক; আর একটি হচ্ছে অচেতন (inconscient) যেটি আমাদের কল্পনাশক্তিকে চালায়। এখন এই দুইটির মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব হয় তবে কল্পনা শক্তি চিরদিন জয়ী হয়। মাটির উপর যদি একখানা দশ মিটার (metre) লম্বা ও ২৫ মিলিমিটার চৌড়া তক্তা পাতা যায়, তা' হলে তার উপর দিয়ে সহজেই তোমরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পার। এখন মনে কর যে তক্তাখানা একটা বিরাট গহ্বরের উপর পাতা আছে; তা' হলে তোমরা আর একপাও অগ্রসর হ'তে পারবে না। এর অর্থ তোমাদের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে তোমাদের কল্পনাশক্তি। তুমি চাও কিন্তু পার না। লোকে ইচ্ছা-শক্তির চর্চ্চার কথাই প্রায় বলে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় কল্পনা শক্তিকে কি রকমে কি ভাবে চালাতে হয় তাই জানা বেশী দরকার। মনে রেখো আমাদের ভিতরের অচেতন সত্বাটিই আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে চালায়। সুতরাং যদি ঠিক ঠিক কল্পনা করা যায়, যে, আমাদের প্লীহাটি অথবা পাকস্থলীটি তাদের কাজ ভাল রকম করছে তবে সেই কল্পনার জোরে নিশ্চয়ই তাদের কাজ তারা ভাল রকম করবে। এটা ধ্রুব সত্য।"

auto-suggestion এর শক্তি দেখাবার জন্যে মুশিঁয়ে ফুএ তাঁর রোগীদের কাছে এই সহজ পরীক্ষাটি করেন। তিনি তাদের জোর করে মুঠো বন্ধ করে

হাত লম্বা করে দিতে বলেন; তারপর বলেন, "ভাব, মুঠো আমি খুলতে চাই কিন্তু পারি নে।" রোগী শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা ভাবে আর সত্য সত্যই আঙ্গুল খুলতে পারে না। মুশিয়ে ফুয়ে তখন আবার বলেন "ভাব, এখন পারি।" রোগী তৎক্ষণাৎ সহজেই মুঠো খোলে। তাঁর উপদেশ এই যে "auto-suggestion অভ্যাস খুব সহজ জিনিষ, রোজ সকালে ও বিকেলে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করবে আর মনকে একাগ্র করবে। পর পর কুড়িবার মনে মনে বলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দড়িতে কুড়িটা গেরো গুণে যাবে (mechanically), যে, "রোজ রোজ আমি সব রকমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছি।"

মুশিয়ে ফুয়ে অবশ্য স্বীকার করেন যে তিনি সব রকম রোগ সারাতে পারেন না। কিন্তু তাঁর রোগীরা যে সব রোগ নিজেরাই সারিয়েছে তা' খুব অদ্ভুত রকম ব্যাপার। কয়েকজন দুরারোগ্য দুষ্ট ব্রণ (cancer) আরোগ্য করেছে, দু'জন যুবতী মেয়ের ন্যাড়া মাথায় নতুন করে চুল গজিয়েছে। এক জন মহিলা এই auto-suggestion দিয়েই তাঁর দাঁত তুলে ফেলেছেন, অথচ কোনই কষ্ট পান নি আর কয়েক second এর মধ্যেই রক্তস্রাবও বন্ধ করতে পেরেছিলেন। অনিদ্রা রোগে এ ওষুধের মার নেই। সময়ে সময়ে আমার এখানে বাস্তবিক ভেল্কির কাণ্ডই (miracle) ঘটে। একজন বৃদ্ধা চাষীর মেয়ে কত বৎসর ধরে হাঁটতে অপারগ ছিল। তাকে নাকি সহরে গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। ফিরে কিন্তু সে হেঁটে নিজ গ্রামে চলে গেছে।" মুশিয়ে ফুয়ে এই ভেল্কির ব্যাখ্যা এই ভাবে দেন, "মেয়েটির সত্যি সত্যিই পক্ষাঘাত হয়েছিল, পরে তার অজ্ঞাতেই রোগটা সেরে যায়। কিন্তু অভ্যাসের ফলে সে মনে করতো, যে, তার পক্ষাঘাত তখনও আছে। সেই জন্যেই auto-suggestion এমন সহজে ও অবিলম্বে কার্য্যকরী হতে পেরেছিল।" auto-suggestion এর উপর মুশিয়ে ফুয়ের অসীম বিশ্বাস। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করছেন যে এর দ্বারা মৃত্যুকে জয় না করতে পারলেও বার্দ্ধক্যকে অবশ্যই জয় করা যাবে। নিজের ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ করা যাবে এবং শুধু তাই নয়, মা যেমন চাইবে সন্তানও ঠিক তেমনই মানসিক ও শারীরিক গুণ নিয়ে জন্মাবে। কিন্তু যদি "দেখি পারি কিনা" এ কথা বললে চলবে না, বলতে হবে, "সন্তান নিশ্চয় এই রকমই হবে।"

তাঁর হাজার হাজার শিষ্যরা মুশিয়ে ফুয়েকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু তিনি সরল ভাবেই বলেন যে তিনি সামান্য নগণ্য মানুষ।

মুশিয়ে ফুয়ে যে তত্ত্বকে কল্পনাশক্তি নাম দিয়েছেন তা' প্রকৃতপক্ষে Faith বা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুয়ের শক্তি আছে কিন্তু জ্ঞান খুব বিরাট নয়, তাই তিনি ব্যাপারটি তলিয়ে বুঝতে গিয়ে বড় গোল বাধিয়েছেন। ভোগ পাগল বহির্ম্মুখ মানুষের এই স্বভাব ; বুদ্ধি ও মনের গণ্ডীর মাঝে সে সব তত্ত্বের রহস্য খুঁজে মরে। বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব করে, কারণ মানুষের হৃদয়ের শক্তি এই বিশ্বাস তার সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অনন্তের মাঝে তার সত্তার দুয়ার খুলে দেয়। "আমি এতটুকু" "এই আমার সীমাবদ্ধ শরীর" "এই এই আমার সামর্থ্য, তার বেশী নেই" এই রকম সব জড়বুদ্ধি আমাদের সত্তার সকল ধামের সংযোগ ছিন্ন করে রাখে। মানুষ একবার সংস্কার মুক্ত হতে পারলেই শক্তি জ্ঞান আনন্দ শান্তি সবই তার অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে বইতে পায় ; বিশ্বের জ্ঞান ও শক্তি অন্তরে স্বতঃই আসে। যোগ মানে মানুষের মন বুদ্ধির সংস্কার ভাঙা ও অনন্তের মাঝে মানুষকে মুক্ত ও বিধৃত করা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস খণ্ডভাবে তাই করে, কিন্তু শক্তিমান ফুয়ের সঞ্চিত বিশ্বাসের তরঙ্গ দুর্ব্বল রোগীর চিত্তে সঞ্চারিত হয়েই তারা এত সহজে বল পায় ; ফুয়ের মত শক্তিমানের কাছে না গেলে আপন ঘরে বসে রোগীকে বহু আয়াসে বহু সাধনায় শক্তি সঞ্চয় করে তারপর সাফল্য পেতে হবে।

ফুয়ের পাশ্চাত্য মন কিন্তু এ কথা মানতে চায় না, যে, এক মানুষ থেকে অপর মানুষে শক্তি বা তত্ত্ব সঞ্চারিত হতে পারে। তাই পক্ষাঘাত গ্রস্থা রোগিনীর বিষয়ে তাঁর অমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা। বিশ্বাসের বল অনেক, কিন্তু তার সঙ্গে জ্ঞান না থাকলে সে বিশ্বাস বৃহৎ জীবনে কার্য্যকরী হয় না, পঙ্গু হয়ে থাকে এবং অশুদ্ধ আধারে মনের বাসনাময় মানুষে সহজেই জগতের অহিতকর হতে পারে।

পশ্চাত্য মনের সত্য অনুসন্ধিৎসার ফলে জড় ও সূক্ষ্ম জগতের অনেক সত্যের প্রকাশ ক্রমে হচ্ছে ; কিন্তু যোগশক্তির অভাবে পরা জ্ঞান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তার গতি বড় এলোমেলো ও হাস্যকর। দি ফোরামের (The Forum) ১৯২১ সালের মার্চ্চের সংখ্যায় রিচার্ড এল্ গার্ণার (Richard L. Garner) কল্পনায় ভাবী মানুষের যা' ছবি এঁকেছেন তা' এমনি সত্যমিথ্যার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। তিনি বলেন, "আহার কমে গিয়ে মানুষের গলনালী ক্ষীণ হয়ে যাবে। প্যালিওলিথিক যুগে মানুষ এখনকার চেয়ে ঢের সহজে নিজের খাদ্য পাক করতো। এখন আহার যেমন জটিল ও ভোগ্যবহুল ব্যাপার রোগও তেমনি

বেড়েছে। ঝোলা নামক বাদামে দেহ পোষণের সার ঘনীভূত ভাবে আছে, এই সব দেখে মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি গুলি বা বড়িতে সার একত্র করে আজ কাল কৃত্রিম খাদ্য তৈয়ারী করছে। এখনই desiccated soups ও নানা রকম মাংস ও দুগ্ধ-সার পাওয়া যায়, এক রকম আগেই হজম করা prediges-ted সহজপাচ্য খাবারও বাজারে দেখা দিয়েছে ; এখন তা' রোগীতে খায়, পরে সুস্থ মানুষেরই তাই আহার হবে। ভবিষ্যতের মানব জাতির মধ্যে উৎসবে নিমন্ত্রণে ভূরিভোজনের ঘটা থাকবে না, যে ঘরে নিমন্ত্রিতরা বসবে সেই ঘরে ফুলের তোড়া থেকে সুধার সার (ambrosial proteides) সুগন্ধে বাতাস ভরে রাখবে। মানুষের স্নায়ু স্পর্শ করে এই সুধাসার আনন্দে সকলকে মত্ত করবে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি সাধনও করবে ; নূতন দৈহিকশক্তি সম্পন্ন শক্তিমান মানুষ সেই সার দেহে আকর্ষণ করে নেবে।

কথা বলতে গিয়ে শ্রোতার কানের কাছে শব্দে ঝড় না তুলে সে যুগে মানুষ telepathy বা ভাব সঞ্চার শক্তিতে বহুদূরের মানুষের সঙ্গেও সচ্ছন্দে কথা বলবে। শরীরের বহু রোগ জয় হয়ে যাবে, আহার সহজ হওয়ায় প্রাণ শক্তির অপচয় স্বতঃই নিবারণ হবে। দূরস্পর্শ ও দূরশ্রুতির মত অনেক শক্তিই মানুষ অর্জ্জন করে দেহে ও মনে সুন্দর ও শক্তিমান হ'য়ে উঠবে। আকাশবাণী ও দিব্যগীত তার নূতন কর্ণে সদাই বাজবে, বহু নূতন বর্ণ ইন্দ্রধনুর শোভায় জেগে চোখের তৃপ্তি সাধন করবে। নিমন্ত্রিত মানবমণ্ডলী পুষ্পাবৃত চক্ষে সুধাসার গ্রহণ করিতে করিতে এইরূপ দিব্যগীত ও দিব্য জ্যোতির বর্ণ ধনুতে আনন্দ পাবে।"

গার্ণারের এই স্বপ্ন-জগত অধিকাংশই কল্পনার আতিশয্য ও খেয়ালের গাঁজা-খুরি ব্যাপার। মানুষে অনন্ত শক্তি লীন আছে তা সত্য, হয় সবই ; কিন্তু সত্য দেহ কিম্বা জীবনকে পঙ্গু করে না, আরও পূর্ণ করে। শুধু রোগ কেন মৃত্যু অবধি মানুষ জয় করতে পারে। অরবিন্দ—বলেন, "রোগ যখন বাহির থেকে আসে তখন প্রথমে তাকে সূক্ষ্ম ও প্রাণ শরীরেই ধরা যায় ও সে অবস্থায় তা সহজেই নিবারিত হতে পারে। মানুষ স্থূল দেহের জ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই হারিয়ে রোগের আক্রমণের কাছে অসহায় হয়ে আছে।" যে বৈজ্ঞানিক এডিশন বিতারা খবর, টেলিফোন, ইত্যাদির আবিস্কর্ত্তা তাঁরা তিন পুরুষে মিতাহারী ও দীর্ঘজীবি ছিলেন। মিতাহারের ফলে তাহার ঠাকুরদাদা ১২০ বৎসর অবধি সবল সুস্থ কর্ম্মঠ দেহে বেঁচে থেকে জীবনের সব সাধ পূর্ণ হওয়ায় দেহ ধারণে বিরক্তির জন্য সহজে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

জগত ভরে এইভাবে মানুষের অভিব্যক্তি তার অজ্ঞাতেই মানুষকে যে অভিসারের পথে বের করে তার চরণ দু'টিকে যে কুঞ্জ অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে তা' আত্ম-রতির অভিসার, সে কুঞ্জও তার গহন আনন্দময় আত্মলোকের কুঞ্জ। মানুষ এবার আপনাকে নিঃশেষ করে পাবে, নিজের স্বরূপের সহজ বিকৃতির মাঝে অটল আসন নেবে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানে তা' উজ্জ্বল, স্বভাবের আনন্দে তা' বিপুল বিশ্বময়, শক্তির শান্ত পূর্ণতায় তা' অবলীলায় সৃষ্টিমুখর।

এ যুগান্তরের আভাস জগতভরেই এসেছে। সকল দেশেই এই বাণী বহন করে আত্ম-জ্ঞানী সাধক চক্র গড়ে ভাগবত আসন রচনায় রত। জার্ম্মাণীতে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-অন-মেনের কাছে ড্রাম্‌ষ্টাডে (Darmstadt near Frankfrot-on-Main) কাউণ্ট কৈসারলিং (Count Keyserling) তাঁর জ্ঞান-পীঠ বা School of wisdom খুলে বসেছেন। তাঁর প্রভাব জার্ম্মাণীতে এখনি প্রবল হয়ে উঠে নব-জার্ম্মণী নির্ম্মাণের কাজে বহু তরুণ স্ত্রী পুরুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। ঐহিক ভোগী কৈসারলিং এখন কবি ও দার্শনিক, তাঁর প্লেটো কনফিউসিয়স বুদ্ধ ও ক্যাণ্টের ভাব থেকে আহরিত নতুন সত্য তরুণ জার্ম্মণীর নিকট জীবনের নতুন ভিত্তি, নতুন ছন্দ এনে দিতে চায়। গত যুদ্ধে বহু রাজ্য ও সম্পদ হারিয়ে আজ সে দেশের তরুণেরা জড়বাদ ও পশুশক্তির ওপর আস্থা হারিয়েছে এবং আত্মার অন্তর্লোকে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছে।

চীন দেশেও জেন (Zen) সম্প্রদায়ের এক শক্তিমান যোগী কঠোর তপস্যা করে আজ এই অধ্যাত্ম সভ্যতার নতুন ভিত দেবার জন্য প্রচার ও সাধনা আরম্ভ করেছেন ; তারও চারিদিকে চীনের চিন্তাশীল যুবক ও নারীরা একত্র হচ্ছে। চীনের ভবিষ্যত যে এই দলের হাতে তা' ক্রমশঃই জগতে প্রকাশ হবে ; এখন নীরব নির্ম্মাণের যোগমগ্ন অবস্থা চলেছে।

ভগবানের নবজগত নির্ম্মাণের ভাগবত মানুষ গড়ার বহু ইঙ্গিত বহুদিক থেকেই নিত্যই আসছে ; চারিদিকে এতকালের অসাধ্য যা' তাই অলৌকিক ব্যাপারে সিদ্ধ হয়ে শক্তির ব্যাপক রাজ্য মানবনেত্রের কাছে খুলে যাচ্ছে। সুকারি (Tsukeari) জাপানী যোগী, তাঁরও মুশিয়ে ফুয়ের মত অলৌকিক বিশ্বাসের বল আছে। তাঁর ব্যবস্থা মতে চলে ২৫১৩ জন মেয়ের মধ্যে ১৯০৮ জন ইচ্ছাশক্তির বলে পুত্র সন্তানের মা হয়েছে। সুকারী বলেন, অন্তঃসত্ত্বা হবার দেড় মাস পর থেকে নিত্য গর্ভিণীকে মনে মনে খুব বিশ্বাসের জোরে ভাবতে হবে, যে, "আমি পুত্র সন্তান কোলে পাব।" তা' হ'লেই মায়ের

মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এ সকলই মানুষের অমানুষ শক্তির ইঙ্গিত। মানুষ মন বুদ্ধির চেয়েও ঢের বড় বড় শক্তিতে শক্তিমান, সে খণ্ড নয়, ক্ষুদ্র নয়।

মানব জাতি বহুবার বহুদেশে পশুর প্রাণপ্রবণ জীবন ছাড়িয়ে হৃদয়ের ও মনের অনুশীলনে জ্ঞানের সভ্যতা গড়েছে। বিবেক বিচার ও জ্ঞানেতে উঠেই মানুষ প্রকৃত মানুষ এই উঁচু ভূমি থেকেই প্রাণ ও দেহের পশুপ্রবৃত্তি ও অন্ধ-জীবন অতিক্রম ও আয়ত্ব করা যায়। দেহ থেকে বুদ্ধি ও জ্ঞান অবধি ওঠা নামাই মাত্র এত দিনের মানব ইতিহাস। আজই যে আমরা এই জ্ঞান গর্ব্বের জীবন ভিত গড়েছি তা' নয়, অনেকবারই গড়ে গড়ে হারিয়েছি। তার নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে কত জায়গায়ই না আমাদের চোখের সামনে ব্যক্ত হয়ে পড়ছে।

Martres-de-Vayre জেলার Clermont Ferrand থেকে ২৫ মাইল দূরে আঠার শতাব্দির আগেকার রোমান গল জাতির কবর বেরিয়েছে। তা' যখন প্রথম খোলা হয় তখন তার মধ্যে সুন্দরী যুবতীর রূপললাম দেহ বসন ভূষণ পাদুকায় সাজান ও নিখুঁৎ অবস্থায় পাওয়া যায়। এতকালেরও কোমল মাংসের লালিমাও তার নষ্ট হয় নি। বাহিরের বাতাস ও সূর্য্যতাপের সংস্পর্শে কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সে অনুপম দেহ ধূলা হয়ে কঙ্কালাবশেষ রেখে ঝরে যায়। কাছে কোথায় কার্বনিক এসিডের উৎস থাকায় এ সকল শরীর এমন নিখুঁৎ ভাবে কাল প্রভাব কাটিয়েও টিঁকে ছিল। সেই যুগের গলদের তৈয়ারী জুতার কারুকার্য্য নাকি অতি অনুপম, সমাধীতে যে সব ফুলদান, চুবড়ি, বাসন-পত্র পাওয়া গেছে তা'তে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষ কত যুগেই না আমাদেরই মত উন্নত ছিল। তাই বলি মানবের জ্ঞানগর্ব্বিত এ মানস সভ্যতা বহু পুরাতন। মনেরও উপরে মানুষের আর এক বৃহত্তর সত্ত্বা আছে, যুগে যুগে সাধকেরা যোগবলে সেই ভূমিতে উঠে জীবনকে রূপান্তর করবার প্রয়াস করেছেন। যুগে যুগে সেই ভাগবত ভূমি হতে জ্ঞান আনন্দ ও শক্তির জ্যোতি নামিয়ে এনে সাধকেরা বহু ভঙ্গিম মানব সত্ত্বার এক এক ধাম আলোয় আলো করে গেছেন ; এ সকলই ছিল নব-মানব গড়বার প্রেরণা, মানুষকে তার পূর্ণ বৈচিত্রে সকল সত্ত্বায় রূপান্তর করে ভাগবত জীবনে সার্থক করবারই ক্রম ইতিহাস। এ যুগে সকল অতীত যুগের সেই অভিব্যক্তি ও রূপান্তরকে একই আধারে সামঞ্জস্য দিয়ে ভগবান মানুষকে দেবতা করেই গড়বেন। জগতকে সে বাণী শুনতে হবে, আজ হোক কাল হোক সত্যের যুগ প্রেরণা সফল না হয়ে ফিরবে না।

বাঁধনহারা

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

আজকে আমার হৃদয়-বীণে
মীড়টেনেছে তারে তারে,
হৃদয়-বীণার সুরে সুরে
মন নেচেছে বারে বারে।
বাঁধনটুটে প্রাণ জেগেছে
ভুল ভেঙেছে ভয় ভেগেছে
মুক্তি এসে ডাক দিয়েছে
আমার প্রাণের দ্বারে দ্বারে।
এতদিনের ঘুমের আবেশ
কাঁট্‌ল আজি নয়ন হ'তে,
মুক্তি পেলাম ব্যর্থ কাজের
অলসরাজের এ দাস খতে।
হঠাৎ আজি নয়ন খুলে
উঠ্‌ল পরাণ হর্ষে দুলে
বাহির হ'লাম সকল ভুলে
যাত্রী নবীন জীবন পথে।
দুর্ব্বলতা কাঁদে কোথায়
অত্যাচারের পাষাণ বুকে,
দুঃখীদীনের রক্ত ধারা
শোষণ করে করাল মুখে।
ভা'য়ে ভা'য়ে করছে হেলা
খেলছে সদাই মরণ খেলা
হিংসাদ্বেষের পক্ষ-মেলা
স্বার্থ-শকুন হাসছে সুখে।

পিষ্ট দুখে ক্লিষ্ট যা'রা
তা'দের বোঝা বইব শিরে,
তা'দের পায়ে লুটিয়ে দেব
অর্ঘ্য দিব হৃদয়টীরে ;
স্নান করায়ে নয়ন জলে
বিজয়মালা দিব গলে
পরাজয়ের মর্ম্মতলে
জয়শ্রীটি আসবে ফিরে,
সমাজের এই বন্দীশালের
সকল শিকল খুলতে হ'বে
মরণের ভয় ভুলেরে আজ
জীবন দোলায় দুলতে হ'বে,
পিছের কথা মিছে গাওয়া
সামনে কেবল এগিয়ে যাওয়া
কাঁদন-ভরা ভিক্ষা চাওয়া
সকলি আজ ভুলতে হ'বে।
প্রাণের ধারা বাঁধন-হারা
ছুটবে জগৎপ্লাবন করে'
আলোর গানে প্রেমের তানে
সকল আঁধার দিবে ভরে'।
মায়ের মুখে ফুটবে হাসি
প্রাণে প্রাণে বাজবে বাঁশী
জীবন-মরণ পাশাপাশি
চলবে হাতে হাতে ধরে'।

খেয়ানী

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১)

হরি খেয়া দিত

ছোট নদী, অগাধ জল তাহাতে প্রখর স্রোত। নদীর অনতি দূরে পল্লীতে হরি থাকিত। সে সেই সকালে বৈঠা আর লগী লইয়া নৌকায় যাইত, দুপুরে ঘরে আসিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিত, আবার নৌকায় গিয়া বসিত। এই তার কাজ। হরি একলা মানুষ,—কোন দায় চিন্তা তার ছিল না। দিনমানে নৌকায় বসিয়া মানুষজন পার করাই তাহার কর্ম্ম ছিল। খেয়া দিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই হরির দিন গুজরাণ হইত। পয়সা জমাইবার চিন্তা তাহার ছিল না। পয়সা জমাইবার কথা উঠিলেই হরি গান ধরিত—

যখন ছিলাম মা'র উদরে
অন্ধকার ঘোর কারাগারে—(হায় রে)
তখন, আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে
কে আমায় বাঁচালে—

সুতরাং কেহ হরিকে আর সে প্রশ্ন করিত না। কেহ জিজ্ঞাসা করিত,—"দু'মাস ছ'মাস বেয়ারাম হয়ে যদি পড়ে থাক"—হরি গায়িত,—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে, হরে কালভয় হবি পার, ভবজলধি।"

হরি খেয়া দিত, কেহ তাহাকে কড়ি দিত, কেহ পয়সা, আধ্‌লা দিত; কেহ ধান চাউলের বার্ষিক চুক্তি করিত। কেহ কেহ কড়ির কড়ার করিয়া পার হইত, পরে কড়ি দিত না, আবার আসিত, আবার পার হইত এবং কড়ি দিতে ভুলিয়া যাইত। এই দলের মধ্যে ভদ্রলোকেরই আধিক্য। দেশের ভদ্রলোকেরা যাহা পরিপাক করিতে পারেন, সাধারণে তাহা পারে না।

হরি অক্ষমের নিকট পয়সা লইত না। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বা ভিক্ষুকের নিকট কখনো কড়ি চাহিত না। ইহারা পয়সা সাধিলে সসম্ভ্রমে জিভ কাটিত।

হরির বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। তাহার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, ভাবে ঢলঢল সরল মুখখানি, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আবৃত সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান কেশদাম

দেখিলে হরিকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। তাহার সরল সুমিষ্ট কথায় সবাই মুগ্ধ হইত। হরির সুমিষ্ট গলা ছিল,—অনেক সময়ই গান করিত, যে শুনিত, সেই আরো শুনিবার জন্য দাঁড়াইত। হরি তাহা লক্ষ্য করিত না, হয় ত একটা বেশ জমাট গান—মধ্যখানেই শেষ করিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। হাসিটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল।

হরি কাহাকেও উঁচু কথা কহিত না। পান বা তামাকের নেশা তাহার ছিল না। হরির কোন শত্রু ছিল একথা কেহ বলে না। সে সুখ দুঃখেরও ধার বড় ধারিত না। বাজে কথায়, বাজে দরবারে, তাহাকে কদাচিত পাওয়া যাইত। সমাজের বিচার, পঞ্চায়েতী কারবার, নিষ্কর্ম্মার তর্ক, গাঁয়ের সই সালিশীর ছায়ায়ও হরি পা দিত না। সে নৌকায় বসিয়া গান গায়িত,—

বাহাত্তর বছরের পাড়ি,
বেলা আছে দণ্ড চারি,
কেমনে হইবে পার (মন আমার)

কখনো বা বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস বিহ্বলে গায়িত,—

দিন যাবে দিন রবে না,
দীনের দিন যাইবে হরি,
রবে কেবল ঘোষণা।

কোনদিন বা হরি ভরসার সুরে গায়িত—

এ ভব সাগর, হবে বালুচর
হাটিয়া হইব পার (নামের গুণে)।

(২)

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজী হরির নৌকায় পার হইয়া যাইতেন। বাবাজীর উপর হরির অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি নৌকায় আসিলে হরি নিজের আঁচল দিয়া খানিকটা জায়গা ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসাইত। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিত,—"প্রভু একটু দয়া করতে হচ্ছে।" বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া সুললিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতেন,—হরি হাঁ করিয়া শুনিত। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িত। কোনদিন বাবাজী গায়িতেন,—

"তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।

দিয়া, মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে
... ...
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।"

জীবন চক্রবর্ত্তী নৌকায় ছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কি বাবাজী "হরি ছেড়ে যে তারা বুলি—"

সহাস্যে বাবাজী কহিলেন—সবই এক রে বাবা—সবই এক। মহাপুরুষ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বলে গেছেন—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবাই আমার এলোকেশী
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।"
ভেদজ্ঞান ছেড়ে দাও বাবা!

বাবাজী গান ধরিলেন—

দূরে যাবে সব ভেদাভেদ
ঘুচে যাবে মনের খেদ
শত শত শত বেদ, তা'রা আমার নিরাকারা।"

চক্রবর্ত্তী কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

(৩)

বাদ্দীদের অনেকই ছিল গরীব। তারা হাট বাজারে দোকান লইয়া যাইত। পাড়ার বৌঝিদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশী তারা বেসাতি লইয়া গাঁয়ে যাইত। এ রীতি এখনো এ দেশে আছে। তখন একটু বেশী ছিল। বেশী রকম ঠেকার পড়িলে সোমত্ত মেয়েরাও গাঁ করিত। তখন দেশে আইনের কড়াকড় না থাকিলেও মানুষের দেহে প্রচুর শক্তি ছিল, দৃষ্টি সরল ছিল, ধর্ম্মের দিকে একটিবার চাহিয়া সকলেই কাজ করিত। তখন পাপের শাসন ছিল বেজায় কড়া আর ধর্ম্ম ছিলেন সহস্র চক্ষু। মানুষ ছোট বড় সবাই ধর্ম্ম আর পাপ দুটার ভয়ে তটস্থ থাকিত। রাস্তা ঘাটে মেয়েদের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

তখন মেয়েরা আবশ্যক মত গাঁয়ের হাটেও বেসাতি লইয়া যাইত। একধারে একটু পাশ কাটিয়া একটু জড় সড় হইয়া তাহারা বসিত। সেখানে ক্রেতারা প্রয়োজন মত যাইত ভিড় করিত না। সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত।

যে সব মেয়েরা বেসাতি লইয়া ওপারে যাইত, তারা একটু সকাল সকাল আহারাদি করিয়া দিনমানের জন্য বাহির হইত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া দিত। আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠী স্বজনের নিকট সে পারের কড়ি লইত না।

মেয়েরা সন্ধার আগেই ফিরিয়া আসিত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া আনিত। পটলি আসিত সকলের পরে, সে তার আয়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইত প্রহরী স্বরূপ। তার ভরা যৌবন ফুটন্ত চাঁপার রূপ তাহার একাকী যাওয়া ভাল বোধ হইত না। বুড়ী বেশী হাটিতে মজবুত ছিল না, কাজেই গাঁ ঘুরিয়া আসিতে পটলির বিলম্ব হইয়া যাইত। সন্ধ্যার সূর্য্য যখন আধখানা নদীর ঐ পশ্চিমের মাথায় ডুবিয়া যাইত, তখন পটলি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া মধুর কণ্ঠে গায়িত—

"হরি, দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো—
পার কর আমারে—"

হরি পটলিকে পার করিয়া আনিত। পটলি নৌকায় পশরা নামাইয়া গায়িত—

"আমি দীন ভিখারী, নাই গো কড়ি
দেখ ঝোলা ঝেড়ে।"

হরি স্মিতমুখে কহিত, পটলি, তোরা যে আমার নায়ে পার হয়ে দুটা পয়সা করিস এই আমার পুণ্যি। এই আমার বাপ দাদার আশীর্ব্বাদ। আমি কড়ি চাই না—দরকার কি? তারপর গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইল—

"সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।"

পাড়ে আসিয়া পটলি হাত মুখ ধুইত। হরি নৌকা বাঁধিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে তুলিয়া দাঁড়াইত। পটলি ছিল তার শেষ পারের যাত্রী। পটলিকে সন্ধ্যাবেলা একাকী নদীর ঘাটে ফেলিয়া যাওয়া হরি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিত না। কারণ তাহার শুনা ছিল "সন্ধ্যার বাতাসে ভর করিয়া নানা দুষ্ট জিন পরী ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই-ইত ভদ্রলোকের মেয়েদের হিষ্টিরিয়ার বেরাম হয়।"

হরি পথে গায়িত—

"তারা কোন অপরাধে এদীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।

(৪)

পাড়ার গণেশ আসিয়া ডাকিল—"হরিদা—ও হরিদা—কি কর—"বলিতে বলিতে সে আঙ্গিনায় উঠিয়া আসিল।

হরি তখন তুলসী তলায় ধূপ দীপ দিয়া একমনে নাম জপিতে ছিল,—কোন উত্তর দিল না। গণেশ আসিয়া তুলসী তলায় গড় করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল।

আপন কার্য্য শেষ করিয়া হরি গণেশকে লইয়া ঘরে গিয়া বসিল।

গণেশ কহিল "এখন কি কর্‌বে দাদা?"

"কি আর কর্‌ব—তুমি বস খানিকটা গল্প গুজব করি বা কীর্ত্তন গাই! রামায়ণটাও পড়তে পারি। তার পর যদি মন রোচে চাট্টি চাল চড়াব—আর মাল্‌সী গাইব।"

"আচ্ছা দাদা, তুমি নিত্যি দিন রেঁধে খাও—একটা বিয়ে কর না কেন?"

"দরকার কি?"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গণেশ কহিল—"বল কি দাদা, বিয়ের দরকার নাই?—আশ্চর্য্যি করে দিয়েছ কিন্তু! আচ্ছা একটীবার ভেবে দেখেছ?"

"ভাবি নি—ভাববার মতন কারণও পড়ে নি।"

"আশ্চর্য্য কথা বটে—কোন দিন এটা ভাব নি?"

"একবার ভেবেছিলাম পনর বচ্ছর আগে—যখন মা ছিলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে একবার কথাটা মনে উঠেছিল। সহসা মা চলে গেলেন,—কথাটাও পাথর চাপা রইল। আর মনেও উঠে নি।"

"যাক্—একটীবার ভেবে দেখ না কেন?"

"কেন ভাই। সখ করে জীবন ভরা একটা নীরস গোলামীর চেয়ে স্বাধীন বন বিহঙ্গের মত গেয়ে দিন কাটিয়ে দিই—এটা কি বেশীবাঞ্ছনীয় নয়?"

"এই গোলামী স্বীকার ক'রেই ত দুনিয়ার জীব বিয়ে করে আস্‌ছে—তাই রীতি।"

"তা দেখেই আমার হুঁস হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা দাদা, বিয়ে না কর—দেখে শুনে একটা কষ্ঠি বদল টদল করে নাওনা।—রাঁধা বাড়ার হেঙ্গামাটা একটু বাঁচবে।" গণেশ অনুকূল উত্তরের ভরসায় আশ্বস্ত ভাবে হরির মুখ চাহিল।

হরি তেমনই সরল উত্তর দিল—"ভায়া তোমার মতলব এই—যে একটা মুখবাঁধা বোঝা ঘাড়ে রাখ্‌তেই হবে—তা সেটা সোনায় ভর্ত্তিই হউক আর মাটী ভরাই হৌক—এই ত?"

"তবে মেয়ে মানুষ জন্মায় কেন?"

'অত ভাবি নি দাদা। আমি আমার বিবেচনায় যা আসে—তেমনই ভাবে কাজ করি—যুক্তি তর্কের ধারেও যাই না; কারণ সেটা আমার ধাতে সয় না।"

"আচ্ছা দাদা, তোমার রামচন্দ্রজী ত সীতাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।" বিজয়ী বীরের মত গণেশ হরির মুখে দৃষ্টি সংযোগ করিল।

হরি দিব্যি সহজ সুরে কহিল—"তাই ত প্রভুর আমার জীবনভরা চক্ষের জল শুকাল না। তাঁর জীবনে কি দুঃখের ওর ছিল রে ভাই?"

গণেশ হতাশ ভাবে কহিল—"নিত্যি দিন রাঁধা, দুঃখু হয় না?"

গণেশের কথা শুনিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—"মেয়েরাও ত রাঁধে।"

গণেশ দুই ঘাট চড়াইয়া কহিল—"মেয়েদের ত সয়—ওইই ত ওদের কাজ। কথায় বলে মেয়ে জন্ম।"

হরি ততক্ষণ গান ধরিয়াছে—

"দিয়ে মায়াবেড়ী পদে ফেলেছ বিপদে"

গণেশ মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

(৫)

নিঝুম দুপুর বেলা, মাঠে মানুষ নাই! পশুপক্ষী পাতার আড়ে চুপ—বাহিরে রৌদ্র অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। এ হেন সময় হরি ভাত চড়াইয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটী
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল—"

দুয়ারে দাঁড়াইয়া পটলি জিজ্ঞাসা করিল—"কি গেরস্ত, এখনো খাও নাই?"

"এই হলো আর কি।"

পটলি সহানুভূতির সুরে কহিল, এই ভয়ানক গরম, সাম্‌নে আগুন—বাইরে মাটীপোড়া রোদ—এত কষ্ট কি পুরুষের সয়?"

হরি বিস্ময়ের সহিত কহিল—"বলিস্ কি পটলি—আজ খুব:গরম বুঝি,—ইস্ সত্যিই ত গা-ময় ঘাম ঝর্‌ছে।—তা এ সময় রাঁধতে পুরুষের যা কষ্ট মেয়েদেরও ঠিক তেমনি হয়,—না?" এই বলিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পট্‌লির নিটোল গাল দুখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে সামলাইয়া লইয়া কহিল, মেয়েদের ওসব সয়। কারণ মেয়েদের ত এই কাজ। হরি ততক্ষণ ভাতে কাঠি দিয়া ভাত টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছে,—

"আর, বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই
ফণী ধরে খাই হলাহল।"

পট্‌লি দরজার পাশে পিঠ ঠেকাইয়া এক দৃষ্টিতে হরির ভাতরাঁধা দেখিতেছিল।

হরি একখানা কাল পাথরের থালায় ভাতগুলি ঢালিয়া লইল। পট্‌লি গালে হাত দিয়া কহিল, "একি করেছ,—মাথা না মুণ্ডু। কতকগুলা পুড়ে গেছে কতক গলে গেছে, আর কতকগুলা আধা চাউল। এ নাকি মানুষে খায়?"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে পটলির মুখের দিকে চাহিয়া সহজ সুরে হরি কহিল—"পেটে আগুন থাকলে সব হজম হয় পট্‌লি! আর আমার নিত্যি দিন খেয়ে এ রকমটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"তরকারী কি রাঁধবে!"

"আজ একটু নুন আর তেল মেখেই এইগুলো উঠাব।"

আবার সেই হাসি হাসিয়া হরি বাম হস্তে তেলের তাড়ি নামাইয়া লইল।

পট্‌লি কহিল "তুমি বারান্দায় বাতাসে একটু বসো, আমি এক লহমার মধ্যে খানিকটা তরকারী রেঁধে দিই।" পট্‌লি দু পা অগ্রসর হইয়া আসিল।

হরি ততক্ষণ ভাতের উপর টাট্‌কা তেল খানিকটা ঢালিয়া নুন লঙ্কা মাখিতে আরম্ভ করিল এবং আনন্দিত মনে বিল্ব প্রমাণ গ্রাস মুখে তুলিয়া দিল।

পট্‌লি বিরক্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

(৬)

তখনো ফরসা হয় নাই। হরি বিছানায় শুইয়া "রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায়" ইত্যাদি আবৃত্তি করিতেছিল। সহসা বাহিরে পট্‌লি খুব তাড়ার কণ্ঠে ডাকিল—"ও গেরস্ত, গেরস্ত—ওঠো দিকিন শীগ্‌গীর!"

"কে, পট্‌লি?"—রঘুনাথায় নাথায়—

"আরে ওঠোই শীগ্‌গীর! জমিদার বাবুদের বাড়ীর ছোট বউর বায়না আছে, এক্ষুণি যেতে হবে—ওঠো শীগ্‌গীর!

"উঠি—দাঁড়া—" "রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং" পাঠ করিয়া হরি ধীরে সুস্থে দরজা খুলিল। পট্‌লি ততক্ষণ গুণ্‌গুণ্‌ স্বরে গাইতে ছিল—

"তুমি পারের কর্ত্তা জেনে বার্ত্তা
ডাকি হে তোমারে।"

"কি পট্‌লি এত ভোরে বেসাতি মাথায় চল্লি কোন দিকে?"

"রায় বাবুদের ছোট বউ যাবেন বাপের বাড়ী! তাঁর ফরমাসি জিনিষগুলি আজই দেবার কথা—তিনি তাড়া দিয়েছেন—তাই।"

"তিন মাইল পথ এই সকাল বেলা যাবি, তোর ঝি কোথা রে?"

"সে খেয়া ঘাটে গিয়ে বসে আছে, চল গীগ্‌গীর।"

হরি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া তুলসী তলা লেপিয়া ফেলিল। তারপর একটু ধূপ জ্বালাইয়া তুলসী প্রণাম করিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে লইল। পট্‌লি আগে আগে গুণগুণ গাইতে গাইতে চলিল—"বড় দয়ার আধার সে কর্ণধার পারের কড়ি চায় না।"

হরি খাইতে বসিয়াছে—দুপুর উৎরে যায়—সহসা পট্‌লি আসিয়া দাওয়ায় উঠিল। ভিজা কাপড়,—অঞ্চল কোমরে জড়ানো! পিঠে দীর্ঘ কেশদাম বাহিয়া জল ঝরিতেছে। পট্‌লি কাঁপিতেছিল।

বিস্ময়ে শিবনেত্র হইয়া হরি জিজ্ঞাসা করিল, পট্‌লি নৌকা এ পাড়ে যে—"তুই এলি কি করে?"

"সাঁতায় কেটে এসেছি।"

ভয়ে বিস্ময়ে হরির গলা অবধি কাঠ হইয়া গেল। সুতি নদী সাঁতারে পার হইতে সাহস করে, হরি ছাড়া তেমন ব্যক্তি ত ঐ তল্লাটে কেউ নাই। "পট্‌লি ভাগ্যিস্‌ ডুবে মরিস্‌ নি!"

ডুবে মরার পথেই গিয়েছিলাম। প্রায় আধমাইল ভাঁটিতে উঠেছি। মর্লেও দুঃখ যেতো না। তোমাকে বলতে বেঁচে এসেছি।"

"এর অর্থ কি পট্‌লি? হয়েছে কি?"

"আমি বাঘের মুখে পড়েছিলাম। দিন রাতের কর্ত্তা, ধর্ম্মের মালীক ঠাকুর আমায় রক্ষা করেছেন! তুমি এখন বিবাহ কর—

"ব্যাপার খানা কি পট্‌লি বাঘ কোথায়!" হরির হাত ভাতেই সংযুক্ত রহিল। তাহার খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"শোন। আজ ক'দিন থেকে রায়দের বাড়ীর ঝি মেঘার মা আমার জিনিস পত্রের ঘনঘন ফরমাস দেয়"। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নি। ছোটবাবু এসে আমার সামনে দাঁড়ান, দর কসাকসি করেন। আজ ছোটবাবুকে দেখিনি।

মেঘার মা অনেক বলেকয়ে আমায় তার বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে বলে ছোটবাবু নাকি আমার জন্য"—পটলি আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল সে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরির চক্ষু গরম হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তারপর তারপর"—

চক্ষু মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় পটলি কহিল "আমি ভাবলাম বড়লোকের বাড়ীর কথা—বিপদ ঘটতে বেশী সময় লাগবে না। তাই তাড়াতাড়ি মেঘার মার বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম। কদমতলার জঙ্গলের ধারে এসে দেখি ছোটবাবুর ঘোড়া নিয়ে একজন দাঁড়ালো। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি সেই পথ ছেড়ে সাহাপুরের পথ ধরলাম। হঠাৎ চেয়ে দিখি জঙ্গলের ধারে ছোটবাবু আর দুটা পেয়াদা। বাবুর হাতে বন্দুক। আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছেন। পেয়াদা দুটা আমার দিকে আস্‌তে লাগল। আমি তখনি প্রাণপণে ছুট্‌তে ছুট্‌তে নদীতীরে এসেছি। আমার জ্ঞান ছিল না। জানি না কোথায় সেই বেসাতি কোথায় বুড়ীটা।"

হরি গর্জ্জন করিয়া কহিল "দেশে এ পাপও ঢুকেছে—উচ্ছন্ন যাবেরে সব উচ্ছন্ন যাবে। এ পাপ ত দুনিয়া সয় না! হাঁ—তারপর?"

"তারপর নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে এসেছি। ভাবলাম তোমায় ব'লে এর বিচার করাব। আমি জানি তুমি লাঠী ধর্‌লে এ দেশে এমন লেঠেল নাই যে এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়। তুমি যাও—ইতরের বিচার কর।"

হরি উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্ক ভাবে পাতের ভাতগুলি কুকুরের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া আঁচাইতে গেল। একাকী কি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল মধ্যে মধ্যে "ছোটবাবু বড় পাপ—সাবধান" শোনা গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া—লগী বৈঠা লইয়া হরি নৌকায় গেল। তাহার মেজাজ ক্রমে একটু নরম হইয়া আসিল। অপরাহ্ণ হরি বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস কণ্ঠে গায়িল,

"হরি তুমি বিচারের মালাক
আমি শুধু দেখব লীলাখেলা।"

পরদিন পটলী যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌লে তবে ঐ পশুটার বিচারের?"

"কি আর কর্‌ব?"

"একদিন রাতে কেন ওর বাড়ী লুটকরে মাথা ভেঙ্গে দাও না। না হয় যেমন তোমার মতলব ঠাহর হয় তাই কর।"

"আমি কেন পটলি বিচার করে নিজে আর একজনের বিচারের অধীন হতে যাব? বিচার কর্ত্তা ভগবান ছোটবাবুর বিচার কর্ব্বেন—তিনি অতবড় রাজ্যেশ্বর—রাবণের পর্য্যন্ত বিচার করেছিলেন।"

(৭)

পাড়ায় গুরুদেব আসিয়াছেন। বিকাল বেলায় বাগ্দীরা মেয়ে পুরুষে জমায়েৎ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে কত কাহিনী শুনে। রাম রাবণের কথা, রাধাকৃষ্ণের বৃত্তান্ত, অভিমুন্যর বীরত্ব—কত গল্প তাহারা শুনিয়া আনন্দ ও পুণ্য লাভ করে! বাগ্দীরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। দুই একজন মাত্র ছেলে বেলায় রাবাজী ঠাকুরের আখড়ায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হরিই ছিল সেরা পড়ো। সে রামায়ণ পর্য্যন্ত সুরকরিয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু নদী পার হইতে লোকের দুঃখ দেখিয়া হরি প্রায় সারাদিন নৌকায় কাটাইত। কাজেই তাহার মুখে রামায়ণ শোনা কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটিত, গুরুদেব আসায় পাড়ার পিপাসু নরনারী কত পুণ্যকাহিনী শুনিতে পাইতেছে। তাহাদের আনন্দের আজ:ওর নাই!

সেদিন সকালবেলা পরাণমণ্ডলের আঙ্গিনায় সকলেই গুরুদেবের "ছিচরণ" দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছে। পুরুষরা গুরুদেবের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়াছে, মেয়েরা কেহ রোয়াকে, কেহ বেড়ার সাম্‌নে বা পাশে দাঁড়াইয়া আছে। এদের তেমন আব্রুর আটকা নাই! ঘরের মেয়েরা পুরুষদের অনতিদূরেই বসিয়া পুণ্যকথা শুনিবার জন্য আকিঞ্চন করিতেছে।

এমন সময় হরি ভূমিষ্ট হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"কে, হরি! এসো এসো বসো; তা ঘর সংসার করেছ—না তেমনই আছ?'

নাথু সর্দ্দার কহিল আজ্ঞে কর্ত্তা ঐ আমাগোর দুঃখ। গাঁয়ের মাঝে ঐ একটা মানুষ, তার কি দুর্ম্মতি হলো, বিয়েথা কর্লে না; তবে কর্ত্তা ধুলো দিয়েছেন আপনাগোর আজ্ঞা কেউ না শুনে ত পার্ব্বে না—"

গুরুঠাকুর হরিকে ঘর সংসার করিতে আদেশ দিলেন, ভাল পাত্রী দেখার ভার পাড়ার "মাথা উঁচা" সর্দ্দারগণ গ্রহণ করিল। কিন্তু হরি যোড় হাতে মিনতির সুরে কহিল "দোহাই কর্ত্তার শ্রীচরণের। আমি বেশ আছি, আমার সুখ

শান্তি নষ্ট কর্‌বার আজ্ঞা কর্‌বেন না। আমায় দুঃখের বোঝা বইবার মুটে বানাবেন না। আমি বিয়ে কর্ত্তে পার্‌ব না স্পষ্ট বলে দিলাম কর্ত্তা দোহাই।"

পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকেই হৈ চৈ করিয়া উঠিল! আ সর্ব্বনাশ গুরুবাক্য।

হরি সকলকেই মিনতি জানাইল। গুরুর পায়ে কত নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ তাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিল না। ঠাকুর আজ্ঞা করিলেন "চতুর্থ দিনে বিবাহের লগ্ন আছে, তোমরা মেয়ে দেখ, আমি বিবাহ দিয়ে তবে যাব।" সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

হরি অগত্যা রুখিয়া দাঁড়াইল। সে দৃঢ়স্বরে কহিল "সেকি কথা! আমার স্বাধীনতার ভার তোমরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছ কেন গো! আমি স্বয়ং রামচন্দ্রজীর হুকুমেও আমার কথার অন্যথা কর্‌তে রাজী নই—"

গুরুদেব কয়েকঘাট নামিয়া হরিকে বিবাহের আবশ্যকতা বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় পাড়ার একদল মেয়ে বৌ ঝি আসিয়া ঠাকুরের পায়ে গড় করিয়া তফাৎ দাঁড়াইল। এই দলে ছিল পটলি।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিধবা মেয়েটী কার রে—

ভোলা যোড় হাতে নিবেদন করিল—"কর্ত্তা এটী পরাণমণ্ডলের মেয়ে। দশ বছরে নগাঁয়ের সাধু সর্দ্দারের ছেলে মাধুর সাথে ওর বিয়ে হয়, দুমাস না যেতে যেতেই তার কপাল পুড়ে গেল! আজ আট বছর ধরে মেয়েটা—আঃ কি কষ্ট কর্ত্তা! মেয়েটা কণ্ঠি বদলও কর্লে না আবার বিয়েও কর্লে না—"

গুরুজী আনন্দে কহিলেন, বেশ এক কাজ কর। দেখে শুনে মেয়েটীর বিয়ে দাও। তোমাদের ত বিধবার বিয়ে হচ্ছেই। আহা মেয়ে ত নয় যেন মা দুর্গা। রাজার ঘরে জন্মালে ঠিক হতো। আয় ত মা আমার কাছে—"

পটলি আবার আসিয়া গুরুদেবের পায়ে প্রণিপাত করিল। গুরুজী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন "মা ভগবানের কৃপায় তোর দুঃখ দূর হোক আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—"

পটলি নতমুখে দাঁড়াইয়া কাপড়ের যে স্থানটা হাতে উঠিল—তাহাই পাকাইতে লাগিল।

গুরুজী সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ওহে একটা কাজ কেন কর না—হরির সঙ্গেই ত পটলির সম্বন্ধ হতে পারে। বাঃ বেশ হবে। সোণায় সোহাগা—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! যেমন বর তেমনি মেয়ে।"

পটলির মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিল। সে ধীর পদক্ষেপে কোথায় সরিয়া গেল। উপস্থিত জনগণ একবাক্যে গুরুজীর প্রস্তাব সমর্থন করিল। পরাণ মণ্ডলকে গুরুজী মত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরাণ জোড়হাতে কহিল "—কর্ত্তা, হরি আমার ছেলের মত! তাকে মেয়ে দিতে আর কথা কি? আপনি দিন করুন,—আমি হরিকে মেয়ে দিব। কেমন হরি—"

হরি যে কোন সময় উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

(৮)

সেদিন সবাই নিত্যকার মত বেসাতি লইয়া গ্রামে গেল। গেল না কেবল পটলি। তার মনটা আজ ভাল ছিল না; সে তার সইয়ের ঘরে মট্‌কা মারিয়া পড়িয়া রহিল।

গুরুদেব বাড়ী ফিরিবার পথে হরির নৌকায় অনেকক্ষণ বসিলেন। হরিকে বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। কহিলেন,—"বাপু, তোমরা শিষ্য—তোমরাই আমাদের ভরষা। তোমরাই আমাদের সম্পত্তি তোমরা বিয়ে কর্লে দুটা পয়সা আমাদের হয়—তোমাদের বংশ থাক্‌লে আমাদের আশা—বুঝলে বাপু—"

হরি মাথা নোয়াইয়া নৌকা বাহিতেছিল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন! ঠাকুরজী অপর পারে গিয়াও নৌকায় বসিয়া হরিকে বৃথা সাধ্য সাধনা করিতেছেন। এমন সময় কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গান ধরিলেন—

"বৃন্দাবনের ধূলোয় কবে গড়াগড়ি দিব—
ব্রজের রঙ্গে লেপি অঙ্গ
যমের আশা কর্‌ব ভঙ্গ
শ্যাম ত্রিভঙ্গে দিবানিশি মহানন্দে নেহারিব।"

হরি কহিল—কর্ত্তা ও পারে লোক দাঁড়াইয়া—ওঁকে পার কর্ত্তে হবে।

অগত্যা গুরুজী নামিয়া গেলেন। হরি যেন অন্ধকার কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তির আনন্দে নিশ্বাস ফেলিল।

বাবাজী নৌকায় উঠিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"পরে হবে রে ঘোর অন্ধকার
আয় কে যাবি ভব নদীর পার—

ওরে দিন থাকিতে চল সে পথে
করিগে পারের যোগাড়"

হরি কথা কহিল না—বাবাজী পার হইয়া গেলেন।

পটলি দুই চার বার জল লইতে আসিয়াছিল, বড় অন্যমনস্ক। কাহারো সহিত কথাটাও কহে নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিল,—হরি আজ দুপুরে বাড়ী যায় নাই,—রাঁধাবাড়া হয় নাই,—সুতরাং আহারাদিও ঘটে নাই। পটলির গা জ্বালা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হরি বাড়ী গিয়া তুলসীতলার কাজ সারিয়া দীপ নিবাইল। পটলি তাহার সই তুফানীর ঘরে বসিয়া দেখিল হরির ঘরে আলো নাই। তখন সে সইকে ধরিয়া পড়িল—"সই, মানুষটা সারাদিন উপোসী—বোধ হয় কিছু খাবে না। তুই যা কিছু খাবার দিয়ে আয় না।"

তুফানী সকালবেলার ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল;—সে পটলির গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—"ইস্ ভারী দরদ দেখছি যে! কথায় বলে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

পটলি তুফানীকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—"তুই মর্—বাঁদী।"

"তাতে তোর লাভ লোকসান কি? আর আমি মলে তোর মনের ঠাকুরকে খাবার দিয়ে আস্‌বে কে?"

"যাঃ—"

"যাব—যাব—যাব—ত্রিসত্যি কর্‌লাম। বাপরে—একটু তর সইছে না। যাব ত, কিন্তু ওযে খাবে তার প্রমাণ? খাবারই বা কি নিয়ে যাব?"

"তোর ঘরে চিড়ে টিড়ে নেই কি"

"হাঁ, চিড়ে আছে আর একছড়া মোটা কলা আছে—তাই নিয়ে যাই। কিন্তু খাবে কি?"

গিয়ে বলিস—"ওগো তোমার তুলসী দেবতার মানস এনেছি—নিবেদন করে দাও।" নিবেদন হয়ে গেলে বলো "প্রসাদ লও,—সে ফেল্‌তে পারবে না।"

তুফানী কলসী হইতে চিড়া বাহির করিতে করিতে কহিল" তোর এত বুদ্ধিও যোগায়? আচ্ছা সই চল্ না, তুইও খাবি।"

"না, আমি ওদের বাড়ী রাতকাল কেন যাব? তুই যা। আমায় হয় ত এক্ষুণি মা ডাক্‌বে।"

তুফানী সের তিনেক চিড়া আর গণ্ডা পাঁচেক কলা লইয়া হরির আঙ্গিনায় গিয়া ডাকিল—"দাদা ও দাদা—ঘুমিয়েছ না কি?"

"কে রে—তুফানী?" হরির স্বর একটু ভার ভার।

"হাঁ দাদা, প্রদীপটা জ্বাল ত দেখি।"

"কেন রে?"

"আর কেন? আজ তোমার তুলসী তলায় কিছু মানত ছিল,—সেটা ভুলেই গেছিলাম। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখ্‌লাম কি—ইস্ এখনো গা কাঁটা দিয়ে উঠে—"

হরি চক্‌মকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বাহিরে আসিল। তুফানী তুলসী তলায় চিড়া কলা রাখিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

হরি নিবেদন করিলে তুফানী এক চিম্‌টা চিড়া কপালে ছোঁয়াইয়া কহিল "দাদা, তুমি তুলসীর প্রসাদ গ্রহণ কর,—আমি চল্লাম।"

"তুফানী—তুফানী—"তুফানী ততক্ষণ ঘরে চলিয়া গিয়াছে। পটলিও ঘরে গিয়া নিশ্চিন্তে শয়ন করিল।

(৯)

পরদিনও বেলা আড়াই প্রহর উৎরে গেল, হরি ঘাটে নৌকায় বসিয়া ভাঙ্গা সুরে টানিতেছে—

"আর কি ছার মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না"

পটলি দু'দিন বেসাতি নিয়া গাঁয় যায় নাই,—তার শরীর নাকি ভাল নয়। কিন্তু দশবার ঘাটে জল নিতে আসিয়াছে। হরির মধুর কণ্ঠ আজ ধরা ধরা—শুনিয়া পটলির কষ্ট হইল। খানিক এদিক সেদিক করিয়া দু একবার কাশিয়া পটলি কহিল—"বলি আজ কি খাওয়া দাওয়া নাই,—বেলা যে যায়।"

"বেলা যায়?—অ্যাঁ—কি বল্‌লি পটলি বেলা যায়? এতক্ষণ আমায় হুঁস ছিল না—তুই বড় সময় মত এসেছিস্—হাঁ আমিও তৈরি হয়ে নি—বেলা যায় এ খেয়াল ত আমার ছিল না—! এখুনি যাচ্ছি—কি করতে পারি দেখি গিয়ে!"

পটলি কথাগুলা শুনিয়া অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেল। হরি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল—যাহারা পারে গিয়াছে, তাহাদের আবার আনিতে হইবে ত?

পটলি সন্ধ্যা বেলায় জল নিতে আসিয়া শুনিল, হরি গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল—

"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন,
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন"

পটলি কলসীতে জল লইতে লইতে কহিল,—"বাড়ী যাবে না?"

"হাঁ—যাব—" হরি ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিল। পটলি আগে আগে যাইতেছিল—সে শুনিতে পাইল হরি উচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছে,—

"আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়; দেখিয়ে না দেখ্ তায়—
ভুলিয়ে মোহমায়ায়—হারায়েছ—তত্ত্বজ্ঞান।"

পটলি আঙ্গুল মট্‌কাইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল ঐ মড়া বাবাজীটা এই সব বাজে গান শিখায়। যত কুজ্ঞান—ঐ মড়ারই পরামর্শ।

রাত্রিতে হরি পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বেড়াইয়া গল্প করিয়া আসিল। গণেশ কহিল—"হরিদা আজ ত তোমার সেই হাসিটা দেখ্‌ছি না।" হরি কোন উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে সকলেই শুনিল হরি গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহার দরজার বেড়ায় একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল, মোটা মোটা হরপে লিখিয়া হরি তাহার যা কিছু গুরুদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছে।

পটলি তুফানীর বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল দেখিয়া তুফানী বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। পটলি ঠোঁট উল্টাইয়া ভাঙ্গাসুরে কহিল মড়া বৃন্দাবনে গেছে ঠিক। আর যেন কারো সেখানো যাবার সাধ হ'তে নাই। মড়া যাবি ত আর যে যে যেতে চায় তাদের নিয়েই যা—

ক্রমে প্রকাশ পাইল হরি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। শুনিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী গান ধরিলেন,—

"আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
যারা, পিছে এল আগে গেল, আমি রৈলাম পড়ে।"

(১০)

কৃষ্ণদাস বাবাজী আর গুরুজীর সঙ্গে গাঁয়ের অনেক স্ত্রী পুরুষ বৃন্দাবনে চলিয়াছে। নকড়ি, ভোলা, পরাণ, সাধুর মা, গুণী, তুফানী,—পটলি সবাই বৃন্দাবনের পথে। কৃষ্ণদাস বাবাজী মনের আনন্দে মধুর হরি নামকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অসংখ্য যাত্রী বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছে।

যমুনার তীরে তীরে অগণিত চটী নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রীরা—সেই সকল চটীতে বাসা করিয়া রহিয়াছে। স্নান, দান, গান, গল্প কোলাহলের অবধি নাই।

বিকাল বেলা পটলি আর তুফানী এই সকল চটীর যাত্রীদিগের মধ্যে বেড়াইতেছিল। তুফানী নানা গল্প হাস্য পরিহাস করিয়া পটলিকে মধ্যে মধ্যে চিম্‌টী কাটা কথাও বলিতেছিল। পটলি একটু চিন্তান্বিতা একটু গম্ভীর। তুফানী কহিল—"সে বৃন্দাবনে কোথাও আছে, এসেছে আট দশদিন আগে,—"

"ওগো ওদিকে যেওনা—ওলাউঠা গো—নিশ্চয় ওলাউঠা! আহা কোন্ অভাগীর পুত গো, না জানি কোন অভাগীর সোয়ামী! অমন সোনার বরণ যেন কেমন হয়ে গেছে।—সঙ্গে কেউ নেই গো—"

পটলি কাণ পাতিয়া কথাগুলা শুনিল। তার বুকের হাড়গুলি যেন খড়্ খড়্ করিয়া নড়িয়া উঠিল—দম আট্‌কিয়া আসিল। তার ইচ্ছা হইল,—তুফানীর সঙ্গ ছাড়িয়া একবার লোকটাকে দেখিয়া আসে।

সেই জনসমুদ্রের মধ্যে পটলির আশাপূর্ণ হতে বিলম্ব হইল না। সে কোমরে আঁচল জড়াইয়া—আকুল আগ্রহে সেই কলেরাক্রান্ত রোগীর চটীতে প্রবেশ করিল। তখন রোগী অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া আছে, পটলি বাহুবেষ্টনে আপন বুক বাঁধিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল হরি!

বড় যোগাড় যন্ত্র করিয়া পটলি গুটী ত্রিশেক টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একটা খাট্‌লী আর একজন চিকিৎসক সংগ্রহ করিয়া আনিল। তারপর অনন্য কর্ম্মা হইয়া রোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়া দিল।

এদিকে চটীতে চটীতে কলেরা লাগিল। কে কার সন্ধান লয়। পটলি রোগীর ঘরে বসিয়া আছে। পরাণ বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া আছাড় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর সকলে দেশে যাত্রা করিল। তুফানী দেশে গিয়া কহিল—যে ভয়ানক মারী লেগেছিল ওর মধ্যেই পটলি মরে গেছে।

হরি আরোগ্য লাভ করিল। কে তাহাকে যমের দুয়ার হইতে টানিয়া আনিয়াছে,—তাহা সে জানিল না। কে তাহাকে বৃন্দাবনে, এই কোঠায় এই বিছানায় আনিয়াছে, কে তাহাকে পথ্য দিতেছে—কিছুই জানিল না। একটা কথা শুধু তাহার মনে পড়ে,—কে যেন তাহার মরণশয্যার পাশে বসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিত "শ্যাম ত্রিভঙ্গ না দেখে তুমি মরবে না।" সেই কণ্ঠ যেন পটলির।

(১১)

"বাবাজী! ও বাবাজী!"

"কা'কে ডাকুছেন?"

"আপনাকে।"

"আমাকে? আমি ত বাবাজী নই—তাই উত্তর দিতে গৌণ করেছি। মাফ করবেন। কেন ডাকৃছেন আমাকে?"

"এই পাশের ঘরে একটী মেয়ে মানুষ রুগ্না—সে আপনাকে একটীবার দেখ্‌তে চায়।"

"আমাকে? আপনি ভুল করৃছেন বাবু।"

"ভুল করিনি গো—ভুল করিনি। উনি আপনাকেই ডাকছেন। আসুন একটীবার—লোকটা মরতে যাচ্ছে"—

"শ্রীহরি শ্রীহরি—দেখুন মহাশয়, আমায় মাপ করুন আমি যেতে পার্ব্ব না—আমায় ক্ষমা করবেন।"

"সাধু পুরুষ, আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু শ্যাম ত্রিভঙ্গ তোমায় ক্ষমা করবেন না। পথে চটীতে যখন বিসূচিকায় মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েছিলে, তখন কে অনিদ্রায় অনাহারে দিন রাত্রি তোমার শুশ্রূষা করেছিল? কার অর্থে তোমার ঔষধ পথ্য চলেছিল? কার অর্থে মানুষ তোমায় মাথায় করে এখানে এনে রেখেছে? কার অর্থে এখানে তোমার খরচ চল্‌ছে? সাধু পুরুষ, অনিয়মের সঙ্গে যুদ্ধ করে সপ্তাহ পরে সেই করুণারূপিনী মা আমার মৃত্যু শয্যায়! আজ তুমি তাকে একটী বার দেখা দিতেও রাজী নও, আশ্চর্য্য! তোমার এক এক খানা হাড় খুলে দিলেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আজ দুদিন শ্যাম ত্রিভঙ্গ দেখে জীবন সার্থক করৃছ কার প্রসাদে? আমি তোমার চিকিৎসা করেছিলাম, বুঝেছিলাম করুণাময়ী মা তোমার কেউ হবেন। পরে জান্‌লাম তিনি তোমার কেউ নন! আমার চোখের ঠুলি খুলে গেল। ত্রিশ বৎসর চিকিৎসা করেছি,—অর্থ উপার্জ্জন ঢের করেছি,—এ পুণ্য দৃশ্য দেখে আমি নূতন মানুষ হয়ে তাকে মা বলে ডেকে পবিত্র হয়ে গেছি। আজ দু সপ্তাহ যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মাকে বাঁচাতে পার্লাম না। আজ দু সপ্তাহ প্রতি মুহূর্ত্ত মা তোমার সংবাদ শুন্‌ছেন। তুমি নিজে হেঁটে গোবিন্দজী দর্শন করেছ শুনে মা হেসে এক আনন্দের নিশ্বাস ত্যাগ কর্লেন। তার পর হতেই তাঁর জীবনী শক্তি কমে আস্‌ছে। সাধু পুরুষ—সেই মাকে দেখা দিতে তোমার আপত্তি?—"

হরি কুণ্ঠিত হইয়া যোড়হাতে কহিল, "অপরাধ করেছি মহাশয়, চলুন তাঁকে দেখে আসি।"

"আপনি আমার জীবন দিয়েছেন আমার জীবনের সাধ পূর্ণ করেছেন, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি—একটীবার চক্ষু—"

রুগ্না চক্ষু মেলিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল "তোমার পা দুখানি আমার মাথায় ঠেকাও—"

হরি জিভকাটিয়া কহিল এমন আদেশ করবেন না। আপনি হয়ত আমায় জানেন না। আমি জাতিতে বাগ্দী।

"আমায়, চিন্‌লেনা আমি পটলি। দাও আমার মাথায় তোমার পা, তুমি আমার উপাস্য দেবতা—দাও তোমার চরণামৃত—একবিন্দু, প্রাণ শীতল করি।"

'পটলি! তুই আমার জীবন দানকরে আজ নিজে মরতে পড়েছিস্। একটু থাক্—আমার ঘরে গোবিন্দজীর নির্ম্মাল্য, চরণামৃত আছে এনে দিচ্ছি।"

পটলি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। খানিক পরে হরি চরণামৃত আনিল পটলির মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল "পটলি এমন অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে তোর অন্তর পরিপূর্ণ ছিল? পটলি অন্ধের জননীর মত তুই যে চিরদিনই আমায় সজাগ পাহারা দিয়ে আস্‌ছিস্ তা আজ বুঝতে পেরেছি। মার কথা মনে বড় পড়ে না! আজ মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তোকে, মা বলে ডাকছি মা—মা—"

পটলি চক্ষু মুদিয়া শুনিল—তারপর কহিল "দাও গোবিন্দজীর চরণামৃত আমার মুখে! খেয়ানী হরি, আজীবন সকাল সন্ধ্যায় খেয়া নৌকায় নদী পার করে দিয়েছো, আজো আমায় পার করে দিচ্ছ। আজীবন তোমার অনুসরণ করে চলেছি! গুরু তুমি আমার! গুরু, আজ বড় আনন্দ বড় শান্তি। এখন নামগান একবার শোনাও যা পথের শেষপর্য্যন্ত নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়।"

হরি পটলির শয্যাপ্রান্তে বসিয়া প্রেমানন্দে গাইল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।

চিকিৎসক হরিকে ডাকিয়া কহিল, "উঠুন, মা চলেগেছেন।" সম্মুখের পথদিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে হরে কালভয়, হবি পার ভব জলধি।"

পূর্ণতা

[শ্রীমতী লীলা দেবী]

ঝ'রে গেছে ফুল ধ'রেছে বৃন্তে ফল
শিখর হইতে নেমেছে নদীতে ঢল
কুসুমের প্রেম, ফল-রসে ভরপুর,
বিলাস হলো যে মঙ্গল সুমধুর।
অধীর নিঝর শান্ত, তটিনীতে
মায়ের মূরতি চটুলা নটিনীতে।
ভালবাসা আজ চাহেনাকো সম্ভোগ
তুমি যদি আমি—কেমনে কাহাতে যোগ ?
শ্যাম ভেবে ভেবে রাধা হ'য়ে গেছে শ্যাম
প্রেমের মাঝারে হারা হ'য়ে গেছে কাম !

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মঘটের ফলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে রফা হইল তাহার মোট কথা এই যে আমাদের ১৪ বৎসর কালাপানির জেলে বন্ধ থাকিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসরের পর আমাদের জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে আর তখন আমাদিগকে কয়েদীর মত পরিশ্রম করিতে হইবে না। জেলখানার ভিতরেও আমরা বাহিরের কয়েদীর মত নিজের নিজের আহার রাঁধিয়া খাইতে পারিব ও বাহিরের কয়েদীর মত পোষাক পরিতে পারিব অর্থাৎ জাঙ্গিয়া, টুপি ও হাতকাটা কুর্ত্তা না পরিয়া কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্ত্তা পরিতে পাইব আর মাথায় একটা চার হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী জড়াইবার অধিকার পাইব। অধিকন্তু ১০ বৎসর যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি অর্থাৎ ধর্ম্মঘটে

যোগ না দিই বা জেলের কর্ত্তাদের সহিত ঝগড়া না করি তাহা হইলে ১০ বৎসর কয়েদ খাটিবার পর সরকার বাহাদুর বিবেচনা করিবেন আমাদের আরও অধিক সুখে রাখিতে পারেন কি না ! জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া ৮ হাতি মোটা কাপড় পরিয়া বা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আমাদের সুখের মাত্রা যে কি বাড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে নিজের হাতে রাঁধিবার অধিকার পাইয়া প্রত্যহ কচুপাতা সিদ্ধ খাইবার দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের হাতও এড়াইলাম। বারীন্দ্রকে বেতের কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল ; হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ করা হইল আর আমি হইলাম ঘানি-ঘরের মোড়ল। প্রাতঃকালে ১০ হইতে ১২ টার মধ্যে রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া লইবার কথা ; কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারিয়া লওয়া অসম্ভব দেখিয়া আমরা সাধারণ ভাণ্ডারা (পাকশালা) হইতে ভাত ও ডাল লইতাম ; শুধু তরকারিটা নিজেদের মনোমত রাঁধিয়া লইতাম। রন্ধন বিদ্যায় হেমচন্দ্রের ওস্তাদ বলিয়া নাম-ডাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে মাংস, পোলাও প্রভৃতি নবাবী খানা তিনি বেশ রাঁধিতে পারিতেন, তবে সোজাসুজি তরকারি রাঁধিতে যে আমাদের চেয়ে বেশী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটা মোচা পাইয়া বহুকাল পরে মোচার ঘণ্ট খাইবার সাধ হইল। কিন্তু কি করিয়া রাঁধিতে হয় তাহা ত জানি না। মোচার ঘণ্ট রাঁধিবার জন্য যে প্রকাণ্ড কনফারেন্স বসিল তাহাতে রন্ধন প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিল না। বারীন্দ্র বলিল—"আমার দিদিমা হাটখোলার দত্ত বাড়ীর মেয়ে এবং পাকা রাঁধুনী, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" হেমচন্দ্র বলিল—"আমি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী রান্না শিখে এসেছি, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" আমাদের সব স্বদেশী কাজেই যখন বিদেশী ডিপ্লোমার আদর অধিক তখন আমরা স্থির করিলাম যে মোচার ঘণ্ট রান্নাটা হেমদাদার পরামর্শ মতই হওয়া উচিত। আমি গম্ভীর ভাবে রাঁধিতে বসিলাম, হেমদা কাছে বসিয়া আরও গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কড়ার উপর তেল চড়াইয়া যখন হেমদা পেঁয়াজের ফোড়ন দিয়া মোচা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন তখন তাঁহার রন্ধন বিদ্যার ডিপ্লোমা সম্বন্ধে আমারও একটু সন্দেহ হইল। মোচার ঘণ্টে পেঁয়াজের ফোড়ন কি রে বাবা ? এযে বেজায় ফরাসী কাণ্ড ! কিন্তু কথা কহিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া তাহাই করিলাম। মোচার ঘণ্ট রান্না হইয়া যখন কড়া হইতে নামিল তখন

আর তাহাকে মোচার ঘণ্ট বলিয়া চিনিবার জো নাই। দিব্য তোফা কাল রং আর চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ! খাইবার সময় হাসির ধুম পড়িয়া গেল। বারীন্দ্র বলিল—"হাঁ, দাদা একটা ফরাসী chef-de-cuisine বটে!" দিদিমা আমার এমনটী রাঁধিতে পারতেন না।" হেমদা হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ! তোমরা সবাই দিদিমা-পন্থী। দিদিমা যা করে গেছেন তা আর বদ্‌লাতে চাও না।" মোচার ঘণ্ট যে দিন রন্ধনের গুণে মোচার কাবাব হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিন কতক পরে একবার সুক্ত রাঁধিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু সুক্ত রাঁধিবার সময় কি কি মসলা দিতে হয় সে বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়া গেল। হেমদা' বলিলেন যে তরকারীর মধ্যে এক আউন্স কুইনাইন মিক্সচার ফেলিয়া দিলেই তাহা সুক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীনা গৃহিণীরা পাঁচখণ্ড পাকপ্রণালী কোলে করিয়া রাধিতে বসেন তাঁহারা সুক্ত রাধিবার এই অভিনব প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন। দাদারও জয় জয়কার পড়িয়া যাইবে।

রাঁধিবার জন্য আমরা জেল হইতে কিছু কিছু তরকারী লইতাম, তবে তাহার মধ্যে চুবড়ী আলু ও কচুই প্রধান। কাজে কাজেই বাজার হইতে মাঝে মাঝে অন্য তরকারী আনাইয়া লইতে হইত। সরকার বাহাদুরের নিয়মানুযায়ী আমরা মাসিক বেতন পাইতাম বারো আনা। আমরা শারীরিক দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের প্রত্যেককে বারো আউন্স করিয়া দুধ দিয়া তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ মাসিক আট আনা কাটিয়া লইতেন। বাকি চার আনার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিছুদিন পরে জেলের মধ্যে একটা ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া বারীন্দ্রের উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয় আর হেমচন্দ্রকে বই-বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব উহাদের প্রত্যেককে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দিবার জন্য চিফ-কমিশনারের অনুমতি চান। পাঁচ টাকার নাম শুনিয়াই চিফ-কমিশনার লাফাইয়া উঠিলেন। কয়েদীর মাসিক ভাতা পাঁচ-টাকা! আরে বাপ! তাহা হইলে ইংরেজ রাজ যে ফতুর হইয়া যাইবে! অনেক লেখালিখির পর মাসিক একটাকা করিয়া বরাদ্দ হইল। যথা লাভ!

ক্রমে ক্রমে আমাদের রান্নাঘরের পাশে একটী ছোট পুদিনার ক্ষেত দেখা দিল; তাহার পর দুই চারিটা লঙ্কা গাছ, এক আধটা বেগুন গাছ ও একটা কুমড়া গাছও আসিয়া জুটিল। এ সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া জেলার মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসিত; কিন্তু সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের মনের এক কোণে আমাদের উপর একটু দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেন না। জেলারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিতেন—'এরা যখন চুপ চাপ করে আছে, তখন এদের আর পিছু লেগো না।' এরূপ দয়া প্রকাশের কারণও ঘটিয়াছিল কর্তৃপক্ষের আটঘাট বন্ধ রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দেশের খবরের কাগজে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহাদের মেজাজটা প্রথম প্রথম বিলক্ষণই উগ্র হইয়া উঠিত; কিন্তু শেষে অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাঁহারাও শিখিয়াছিলেন যে কয়েদীকেও বেশী ঘাঁটাইয়া লাভ নাই।

মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইবার প্রবলতর কারণ জর্ম্মানীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধিবার অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তাদের মুখ যেন শুকাইয়া গেল। কয়েদীদের তাড়া করিবার প্রবৃত্তি আর বড় বেশী রহিল না। অষ্ট্রীয়ার রাজ-পুত্রের হত্যাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারী নগরীর ২০ মাইলের মধ্যে জর্ম্মান সৈন্যের আগমন সংবাদ সবই আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া পাইতেছিলাম। শেষে যখন এমডেন আসিয়া মাদ্রাজের উপর গোলা ফেলিয়া চলিয়া গেল তখন ব্যাপারটা আর সাধারণ কয়েদীর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইল না। ইংরেজের বাণিজ্য ব্যাপারের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তাহা কয়েদীদেরও বুঝিতে বাকি রহিল না। আগে পিপা পিপা নারিকেল ও সরিসার তৈল পোর্টব্লেয়ার হইতে রপ্তানী হইত, এখন সে সমস্তই গুদামে পচিতে লাগিল। জেলে ঘানি চালান বন্ধ হইয়া গেল। শেষে কয়েদীর নিকট হইতে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (war loan) করা হইতে লাগিল তখন পোর্টব্লেয়ারে গুজব রটিয়া গেল যে, ইংরাজের দফা এবার রফা হইয়া গিয়াছে। জেলের দলাদলি ভাঙ্গিয়া গিয়া শত্রুমিত্র সবাই মিলিয়া জর্ম্মানীর জয় কামনা করিয়া ঘন ঘন মালা জপিতে আরম্ভ করিল। জর্ম্মানীর বাদসা নাকি হুকুম দিয়াছে যে সব কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে! সাহেবদের আরদালীরা আসিয়া খবর দিতে লাগিল যে আজ সাহেব সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, কাল সাহেব না খাইয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল

ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তা জুটিয়া গেল। কেহ বলিল পীরসাহেব স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে ১৯১৪ সালে ইংরেজের ভরা ডুবিবে, কেহ বলিল এ কথা ত কেতাবে স্পষ্টই লেখা আছে! মোটের উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই একই আলোচনা চলিতে লাগিল।

কয়েদীদের মনের ভাব শেষে কর্ত্তৃপক্ষেরও অগোচর রহিল না। ইংরেজ যে যুদ্ধে হারিতেছে না একথা প্রমাণ করিবার জন্য জেলের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট আমাদিগকে বিলাতের টাইমস পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়িতে দিতেন। কিন্তু টাইম্‌সের কথা বিশ্বাস করাও ক্রমে দায় হইয়া উঠিল। টাইম্‌সের মতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য প্রত্যহ যত মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, মাস কতক পরে তাহা যোগ দিয়া দেখা গেল যে তাহা সত্য হইলে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যের জর্ম্মানী পার হইয়া পোলান্দে গিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল; অথচ, পোলাণ্ড ত দূরের কথা, রাইন নদীর কাছাকাছি হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ কয়েদীরা ইংরাজের স্বপক্ষে কোন কথা কহিলে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিত। কর্ত্তারা যে মিথ্যা খবর ছাপাইয়া তাহাদের পট্টি দিতেছে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না!

নূতন নূতন যে সমস্ত কয়েদী দেশ হইতে আসিতে লাগিল, তাহারা নানা-প্রকার অদ্ভুদ গুজব প্রচার করিয়া চাঞ্চল্য আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক দল আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল যে তাহারা বিশ্বস্তসূত্রে দেশ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে এমডেন পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে সশরীরে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে গুজবটা মিথ্যা! তাহারা যে ভাল লোকের কাছে ও কথাটা শুনিয়াছে! শ্রুতির চেয়ে প্রত্যক্ষটা ত আর বড় প্রমাণ নয়!

ক্রমে পাঠান ও শিখ পল্টনের অনেক লোক বিদ্রোহের অপরাধে পোর্ট-ব্লেয়ারে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের কেহ কেহ ফ্রান্স, কেহ বা মেসো-পোটেমিয়া হইতে আসিয়াছে। পাঠানদের মুখে মুখে এনভার বে'র দৈব শক্তি সম্বন্ধে যে সব চমৎকার গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল তাহা শুনিয়া কয়েদীদের বুক আশায় দশ হাত হইয়া উঠিল। এনভার বে তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলে নাকি খোদার কোদ্‌রতে তোপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি আবার নাকি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন মুলতান সরিফে আসিয়া

অচিরে জগদ্ব্যাপী মুসলমান সাম্রাজ্য, প্রতিষ্ঠার আশা দিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মানীর বাদশাও নাকি কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে!

এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়া কয়েদীদের বিদ্বেষভাজন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও ফল নাই দেখিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম। তবে যথাসম্ভব সত্য ব্যাপার জানিবার জন্য সংবাদ পত্র জোগাড় করিবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। গদর দলের শিখেরা পোর্টব্লেয়ারে কয়েদ হইয়া আসিবার পর পাছে জেলের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, সেই ভয়ে জেলে পাহারা দিবার জন্য দেশী ও বিলাতী পল্টন আমদানি করা হইয়াছিল। বিলাতী পল্টনের মধ্যে আইরিস অনেক ছিল। আর তাহারা যে ইংরেজের বিশেষ শুভার্থী ছিল তাহাও নয়। সুতরাং সংবাদপত্র সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। তা' ভিন্ন নূতন নূতন যে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদী আসিতে লাগিল তাহাদের নিকট হইতেও দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। এমডেন ধরা পড়িবার পরে একটা গুজব শুনিয়াছিলাম যে ঐ জাহাজে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের একটা প্ল্যান ছিল; বোধ হয় ভবিষ্যতে কোনরূপ আক্রমণের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পোর্টব্লেয়ারে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল ও দুই চারিটা তোপেরও আমদানি করা হইয়াছিল।

পোর্টব্লেয়ারে মিলিটারী পুলিসের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদের মধ্যে শিখও যথেষ্ট। পাছে গদর দলের শিখেরা মিলিটারি পুলিসের সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায়, এই চিন্তায় পোর্টব্লেয়ারের কর্ত্তারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই ভয়ে জেলের ভিতরকার শিখদিগের উপর তাঁহাদের ব্যবহার বেশ একটু কঠোর হইয়া দাঁড়াইত। একে ত আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদিগের রুটি ও মাংস খাওয়া অভ্যাস; জেলের খোরাক খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না; তাহার উপর মাথায় লম্বা লম্বা চুল ধুইবার জন্য সাবান বা সাজিমাটী কিছুই পায় না। শেষে যখন তাহাদের উপর ছোট ছোট অত্যাচার সুরু হইল তখন তাহাদের মধ্যে একজন (ছত্র সিং) ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। বেচারীকে তাহার ফলে দুই বৎসর কাল পিঞ্জরার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ধর্ম্মঘটও পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু যে সকল নেতারা শিখদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন তাঁহারাই কার্য্যকালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া

গেল। যুদ্ধ থামিয়া গেলে আমাদের ভাগ্যবিধাতা আমাদের জন্য কোন নূতন ব্যবস্থা করেন কিনা তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমশঃ।

অকরুণ পিয়া

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশী।
পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি॥
পথিক ব'লে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষাভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি॥
তখন মোদের কিশোর বয়েস যেদিন হঠাৎ টুটলো বাঁধন,
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর জগৎ-জোড়া শুন্‌ছি কাঁদন্!
সেই কিশোরীর হারা-মায়া
ভুবন ভ'রে নিল কায়া,
ভুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি'॥

মনস্তত্ত্বের দিক

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কথা হচ্চে—

পাশ্চাত্য দেশে যেখানে মুখের বুলি—Perish secrecy! Tear off veils! Banish all reserve between the sexes! সেখানেও কাজের ধারাটুকুর বেলায় মেলামেশা অবাধে চলে না। মেলামেশা বারণ নয় এই পর্য্যন্ত,—না চলবার কারণ যথেষ্ট আছে। সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এমন ভাবে

সাজান যে ও জিনিষটা আছে স্থূল চোখে দেখায় মাত্র। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কার্য্যতঃ নেই। অবশ্য সমাজের নিম্নস্তরের কথা স্বতন্ত্র। সে কোন্ দেশেই বা নয়!' ইংলণ্ড জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের আভিজাত্য শ্রেণীর ঘরে ধরাবাঁধা আমাদের দেশে ভদ্র ঘরেরই মত।

প্রাচ্যের ব্যবস্থাটা অনেকটা যেন পাশ্চাত্যের উল্টো। এ দেশের অবস্থাটা যেন কড়ায় কড়ী কাহণে কাণা। মুখের বুলির ভিতরে ছুঁচ গলে না বটে,—ব্যবস্থা এমন আঁট সাঁট। কাজের বেলায় কিন্তু হাতি গলে যায়,—অভ্যাস এত শিথিল। যাঁরা জিনিষটা বুঝতে চান তাঁদের unbiassed হয়ে এই কলিকাতারই গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া হিন্দু পরিবারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে বলতে পারি।

গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া ব্রাহ্মর উদাহরণটা সামাজিক অভিমত হিসাবে দিচ্চি না। symbol হিসাবেই দিচ্চি। খুব unbiassed হয়েই দিচ্চি। একেবারেই উদাহরণ মাত্র।

আমাদের দেশে ত বটেই, পৃথিবীর সকল দেশেই তাই,—মানুষ এতদিন যেন পূর্ব্বপুরুষের জমান টাকার মত পূর্ব্ব যুগের সঞ্চিত কর্ম্মে বাঁচছিল,—সে সঞ্চয় এইবার ফুরিয়েছে। এতদিন সত্য সত্যই কোনও দেশে মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবার কোনও দায় হাজির হয় নি। মেয়েরা অনেক দেশেই বাইরে এসেছে কর্ম্মে ভিড়েচে, হয় সখ নয় ভাবের প্রেরণা, যা হোক এই রকম একটা কিছুতে। এখনকার অবস্থা আর তা নয়। ঠিক আজিকার পৃথিবীতে যদি নিখিলেশকে বিমলার কাছে ঘরে বাইরের হিসাব দিতে হয়, সম্ভবতঃ তাকে বলতে হবে—ঘরে তুমি আমার জন্য যা করচ এ সামান্য কিছু, আমিও তোমার জন্য যা কর্চ্চি যৎসামান্য মাত্র। বাইরে তুমি এর চেয়ে অনেক কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে,—আমিও পার্ব্ব। আর পরস্পর তা না কর্লে আমরা বাঁচতেও পার্ব্ব না। দিনকাল এমন পড়চে।

সংসারটা মেয়ে পুরুষের লেন দেন নিয়ে বাণিজ্যের নিয়মেই চলচে এ কথা অস্বীকার করে তর্ক করা গায়ের জোর ফলানরই সামিল। বাণিজ্যে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের বলি বেণিয়া। ইংরাজ যে জাত বেণিয়া সে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি। সম্প্রতি সংবাদ এসেচে যে "বিলাতে নারী আর একটি নূতন অধিকার লাভ করিলেন। স্থির হইয়াছে, এখন হইতে তিন বৎসর পরে তাঁহারা বিলাতের সিবিল সার্ব্বিসে পুরুষের ন্যায় প্রবেশাধিকার পাইবেন।"

অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁরা সে দেশের পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। আরো ঠিক হয়েছিল যে পুরোহিতের কাজ বিচারকের কাজ আর এই সিবিল সার্ব্বিস তিন ছাড়া অপর সকল কাজই তাঁরা কর্ত্তে পার্ব্বেন। সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিসও মঞ্জুর হয়ে গেল। কালে কালে ও দুটোও মঞ্জুর হবে না কে বলতে পারে? বেণের বুদ্ধি ঠক্‌বার চিজ নয়। ইংরাজ জাতি ভাবোচ্ছাসে কিছু চালাবার বান্দা নয়। ইংরেজের ঘরে যখন চলে গেল তখন বুঝতে হবে ওর ভিতর আব্দার নেই ধাপ্পা নেই আছে খাঁটি নিরেট যোগ্যতা। মেয়েরা উপযুক্ত সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ থাকতে এ মঞ্জুর হবার কথা নয়, সন্দেহ মিটেই তবে মঞ্জুর হয়েচে। আরো একটা কথা আছে। যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েচে, হলেই বা। যোগ্যকে তার উপযুক্ত আসন দিতে সংসার কি হাত ধুয়ে বসে আছে নাকি? কাজের সঙ্গে কাজের একটা বেতন আছে। কাজটা করা যত শক্তই হোক সে লোভটা ছাড়া আরো শক্ত। বেণের লোভও খুব অতিরিক্ত। এই লোভের সঙ্গে সেখানে কি রকমে মিটমাট হল? বেণিয়া কি সেখানে আপনার জাতিধর্ম্ম ছেড়ে হঠাৎ সুবিচারের অবতার হয়ে উঠেচে! আমাদের ঘরে পুরুষদের কথাটা নিয়ে একটু ভাবতে অনুরোধ করি। মনে থাকে যেন movement এবং agitation এর ক্ষেত্রে এতদিন তাঁরা রূপক হিসাবে মেমসাহেবদের সতীন ছিলেন। কর্ত্তাটী সুবিচারের কলার কাঁদি কি না তাঁরা ত জানেনই।

সত্য কথা এই এখানেও ব্যবসার কার্য্য নির্ব্বাহ (Transaction) হয়ে গেছে।

কেমন, না অর্থটা যদি সম্পদ হয় কর্ম্মও একটা সম্পদ। অর্থের মত তারও একটা হিসাব পদ্ধতি (economy) আছে। তারই নীতি অনুসারে সেখানে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে মেয়েদের কর্ম্মক্ষমতা এই সব কাজে লাগালে Nation এর কর্ম্মক্ষমতা আরো অনেক কুলিয়ে যাবে। যোগ্যতায় গ্রেটব্রিটেন উঁচিয়ে উঠবে।

এ ব্যাপারটা হঠাৎ এমন পরিষ্কার হয়ে উঠলই বা কেন? হঠাৎ হয় নি। বাইরের বায়ুমণ্ডল উষ্ণতায় ৫০° ডিগ্রি হতে ৪০° ডিগ্রিতে নেমে পড়ে শরীরকে ঐ ১০° ডিগ্রির উপযুক্ত বেশী তাপ সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন করে নিতে হয়। এই জ্ঞান ও এই ব্যবস্থা ঠিক এমনি করেই হয়েচে, হঠাৎ হয় নি। ব্যাপার এমনটা দাঁড়িয়ে পড়েচে যে বাইরের জগৎ ডিগ্রি কতক বেকে নির্ম্মম হয়ে গ্রেটব্রিটেনকে চেপে ধরেচে। সেই ডিগ্রিকতকের উপযুক্ত যোগ্যতা সঙ্গে উৎপন্ন করে না নিতে পালে গ্রেটব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে না।

বিলাতের এই সংবাদটুকু আমি উদ্ধৃত করেছি বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক বসুমতী হতে। তার কারণ কাগজটীর মন্তব্যটুকু আমার কাজে লাগবে। মন্তব্য এই যে অধিকার টুকুকে নারীর ন্যায্য অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েচে। আনন্দের সংবাদ বলেও স্বীকার করা হয়েচে। অবশ্য ভারতের নারীর এতখানি অধিকার ন্যায্য কিনা সে সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, সে উল্লেখের প্রয়োজনও বুঝি না। এ অধিকার লাভে উপযুক্ত হলে নারীর এ অধিকার লাভ ন্যায্য আর পুরুষের পক্ষেও সেটা আনন্দের সংবাদ এ স্বীকৃতিটুকুও আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এমন সংবাদ ভারতের নারীকে যোগ্যতা উপার্জ্জনে উৎসাহ দিতে পারে। আমি দৈনিক বসুমতীকে এইটুকুর জন্যই ধন্যবাদ দিচ্চি। পাটেল-বিল প্রভৃতি ব্যাপারের সময় প্রতিবাদ পক্ষেই দৈনিক বসুমতীর স্থান, সেটা রক্ষণ শীতলার পরিচয়—আবার circulation 16000 Daily এটাও লোক প্রিয়তার পরিচয়। সুতরাং রক্ষণশীল সমাজের অনেকেরই কল্যাণ কর্ম্মে নারীর যোগ্যতা উপার্জ্জন চেষ্টা মতের অনুকূল দাঁড়াইয়াছে বসুমতীর মন্তব্যে আমার এইটাই যেন মনে হল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের সঞ্চিত কর্ম্ম ফুরিয়েছে—বাঁচতে হলে এখন প্রত্যেক জাতিকে নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তে হবে, গ্রেটব্রিটেন উপস্থিত এটা বুঝেচে এর ব্যবস্থা কর্চে—মেয়েদের নূতন অধিকার দান সেই সঙ্গেই হয়ে গেছে। ভারতবর্ষেরও সঞ্চিত কর্ম্ম ফুরিয়েছে তা সত্য—নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তে হবে তাও প্রত্যক্ষ—এখন বোঝা আর ব্যবস্থা করা এইখানটাতেই নাকি ঠেকে গেছে। আমরা বুঝ্‌ছি—বুঝে ত এখনও কিছু ঠাহর কর্ত্তে পারি নি সেটা কি? ব্যবস্থা বড় সোজা ব্যাপার নয়। একবার কবে ব্যবস্থা হয়েছিল সে কত মুনি ঋষি এসে তবে।

গ্রেটব্রিটেনের বোঝা এখনও শেষ হয় নি; কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। বোঝার ভুলের দরুণ ব্যবস্থার ভুল হয়ে গেলেই যে জাত যাবে এমন ভয় তারা করে না। বলে তখন ঠিক বুঝলে ব্যবস্থাটাও না হয় শুধরে ঠিক করে নোব।

ব্যবস্থা ত হয়ে গেল যে মেয়েরা ঐ সব কাজ কর্ব্বে—কেন?—না তাদের বুদ্ধি ও বৃত্তিতে চমৎকার ওসব কাজ কুলিয়ে গেছে! এখন ও সব কাজ কর্ত্তে হলে ত মেয়েদের অবাধে মেলামেশা কর্ত্তে হবে। পুরুষে পুরুষে যেমন মেয়ে পুরুষেও তেমনি একটা অবাধ অক্ষুণ্ণ স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে হবে। মেয়ে পুরুষ উভয়েরই বৃত্তিতে বুদ্ধিতে ওটাত বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বে চমৎকার কুলিয়ে

যায় নি। সে রকম মন হলে আজ পর্য্যন্তও সামাজিক বিধিব্যবস্থা কার্য্যতঃ মেয়ে পুরুষে অবাধ মিলনের অন্তরায় খাড়া রেখেছে কেন? ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্ম সঞ্চয়ার্থ যে সব ব্যবস্থার প্রচলন কর্ত্তে হয় তাতে অবাধ মিলন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে—আবার অবাধ মিলন চালাতে গেলে তার উপযুক্ত একটা মনস্তত্ত্ব না হলেও নয়। প্রাণের দায় ঠেকেচে। বিধি ব্যবস্থা চাইই। আবার সেই দায়কে সর্ব্বস্ব করে মনস্তত্ত্বের উপযোগীতা অস্বীকার কর্লেও চলে না। সে ভাবে চলতে গেলে সমাজের জোট এমন পাকিয়ে যাবে এমন সব সমস্যার উদয় হবে যে সে সব সামলান অসম্ভব বল্লেই হয়।

এই যেমন আলোচনা করচি এমন আলোচনা সেখানে হয় নি। সেখানে নূতন কিছু চালিয়ে দেওয়া হয়েচে আর সেই নূতন কিছু চলবার জন্যে নূতন কিছু শেখাবার ব্যবস্থা হচ্চে। মনে কেমন একটা জোর, হবেই। হা হতোস্মি ভাব একবারেই নয়। খোঁচ্ খাঁচ্ যা দেখচে বীরদম্ভে বলচে—ও বেঁক কুঁদের মুখে সিধা হবেই। এই সমস্ত কারণে Sex-instruction এখন বিলাতী আসর জমাচ্চে মন্দ নয়। সেখানে London University Conference on Education বসলেও তাতে এ আলোচনা দূষ্য নয়। সে আবার আধ্যাত্মিক আলোচনা হলে বাঁচতুম! সম্প্রতি নাকি একটা প্রবল আলোচনায় স্থির হচ্ছিল—early education in Sex-biology and sex-psychology was the child's best and only safeguard. অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান ছেলেদের খুব অল্পবয়স থেকে শিখিয়ে রাখলে তাদের বিপদের ভয় সবচেয়ে কেটে থাকে।

অর্থাৎ এ বিষয়ে নিজের ভালমন্দ আর দুনিয়ার কাণ্ড কারখানা জেনে ছেলে মেয়ে ঝানু হয়ে থাক। মানুষের ইচ্ছাটার স্বাভাবিক গতি ত ভালরই দিকে। সব জিনিষ অবাধে জানিয়ে রাখলে অবাধে ছেড়ে দিতে দোষ কি?

আমরা কিন্তু এ ব্যবস্থায় কিছুতেই রুচি প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্ব না! ছেলে মেয়ে গুলোকে এঁচোড়ে পাকিয়ে তুললে তাদের মন্দথেকে রক্ষা করা হবে এ যুক্তি পরিপাক করা আমাদের কর্ম্ম নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আর একরকম বলে। সে যাই হউক, তাঁদের ও কথাটাও তাঁদের দেশে নূতন নয় তাঁদেরও বোঝার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ওই দিকে আছে। মানুষের ইচ্ছার স্বাভাবিক গতি ভালর দিকে। এই জ্ঞানের ওপর ভারা মানুষকে অবাধে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। মানুষও সেখানে খুব সতর্ক, কোন্‌টা কি বুঝে বুঝে আপনার

পায়ের ওপর ভর্ করে এগোয়ও বৈকি! মন্দকে তারা ভয় করে না, আমরা যে ভাবে ঘৃণা করি তাদের ঘৃণাটাও ঠিক্ সে ভাবের নয়। তারা সাহসের সঙ্গে জোর করে মন্দকে নিংড়ে তার থেকে ভালকে বারকরে নেয়। তাদের মনস্তত্ত্ব আর আমাদের মনস্তত্ত্বে তফাৎ আছে।

দেখ না কেন আমরা জানি না কি অতি নিকৃষ্ট জাতিয় সুখ পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মানন্দেরই আভাষ। কিন্তু কি তাই বলে বলচি যে নিকৃষ্ট সুখকেই মেনে নাও সেই ক্রমশঃ উৎকৃষ্টে উঠবে। ঠিক ঠিক জেনেও বুঝে চলবার চেষ্টা থাকলে ঐ ভালর দিকে ইচ্ছার যে স্বাভাবিক গতি আছে সে আভাষকে প্রকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবেই। আমরা ত তা বলি না, আমরা বলি শেষ যখন উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্টের ভিতর দিয়েই উৎকৃষ্টে পৌঁছাতে হবে এমনও কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই তখন কিসের জন্য আমরা নিকৃষ্টকে স্পর্শ কর্ত্তে যাব। তাকে এড়িয়ে কি উৎকৃষ্টে হাজির হওয়া যায় না? আবার নিকৃষ্ট যখন আছে তাকে এড়িয়ে চলবার মুখে হঠাৎ তার সামনে পড়বারও সম্ভাবনা আছে।

আমরা নিকৃষ্টকে এড়িয়ে চলি তাই এত ধরা বাঁধা—সে হঠাৎ এসে পড়লে চেপে যাই, চুপে চুপে তাকে ঝেড়ে ফেলি তাই গেরোর মুখেও ফাঁস রাখতে হয়। ওরা নিকৃষ্টকে ধরেই তার ভিতর দিয়ে উৎকৃষ্টে পৌঁছাতে চায় তাই নিকৃষ্ট যাতে নিকৃষ্টই দাঁড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে ওদের দিনরাত নিকৃষ্টকে ঠেলতে হচ্চে। আমাদের ধরাবাঁধা নিয়মে আছে আবার নিয়মের অনবরত ব্যতিক্রমও আছে। ওদের নিয়মে ধরাবাঁধা নেই কিন্তু কাজে দিনরাত ধর্ ধর্ চলেচে। এই জন্যে আমাদের মুখের কঠোরতা কাজের বেলায় শৈথিল্য দাঁড়িয়ে যায়। ওদেরও মুখের উদারতা কাজের সময় বেহদ্দ সঙ্কীর্ণতা হয়ে পড়ে। মনের স্তরে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর শ্লেষ করি ঘৃণা করি কিন্তু মনের উপরের যে স্তর—সেখানে উভয়েই একস্থানে দাঁড়িয়ে আছি।

মন একই মানুষের যখন আজ এক, কাল আর হয় অথচ মানুষ সেই মানুষই থাকে তখন মন ছাড়া যে আমাদের মধ্যে আর একটা কিছু আছে—তার ওপরে আর একটা স্তর আছে সে আর বোধ করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নাই। জিনিষটা কি না বুঝলেও জিনিষটা যে আছে তা বেশ বোঝা যায়। যে মেয়ে পুরুষের মিলন নিয়ে পৃথিবীতে এত ধরাবাঁধা এই মনের স্তর ছাড়িয়ে উঠলে সেই মেয়ে পুরুষের মধ্যে অবাধ মিলন ত তুচ্ছ কথা—অভেদ মিলনও

মানিয়ে যায়। মনের স্তরের ওপরের যে জ্ঞানদৃষ্টি তাকেই বলে দূরদর্শন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

বিলাতে মেয়েদের যতখানি অধিকার দেওয়া হল তাতে তাদের আর্থিক স্বাবলম্বন আসবে নিশ্চয় সুতরাং একটা বড় নিকৃষ্টের সম্ভাবনাকে সে বন্ধনমুক্ত কর্ল,—আমাদের মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ভাবলে আমরা তাইই মনে করি বটে কিন্তু তাদের মন দিয়ে তারা নিকৃষ্টের সম্ভাবনাটাকে উৎকৃষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়াই মনে কর্চে। জানচে বটে যে নিকৃষ্ট জুড়ে বসবার চেষ্টা কর্লে তাকে খুব বড় ধাক্কাই দিতে হবে, সে ধাক্কা দেওয়াও তাদের স্বধর্ম্ম সিদ্ধ। আর যদি প্রয়োজন হয় তার জন্য যা উপকরণ সেও তাদের হাতের কাছে আসবেই। তখন তারা মরবে না বা অধঃপাতেও যাবে না।

বাহিরের জগতের নির্ম্মমতা আমাদের Freezing-point একেবারে নাকি 32. Fahrenheit এ চেপে ধরেচে। এই ইজিপ্সিয়ান মমিবৎ অবস্থাতেও আমাদের স্নায়ুজাল আন্দোলিত হতে আরম্ভ করেচে। ডিগ্রিকতক যোগ্যতা না উৎপন্ন কর্লে আর চলচে না। অর্থ সম্পদ ত বহুদিন হতেই অনর্থ বলে মাটিতে গেড়ে বসেচি তার ওপর দিয়ে এখন বিলেতী exchange এর আদরের জল গড়িয়ে আমাদের মান মর্য্যাদা সব ধুয়ে নিয়ে চলেচে। দেহে প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুক্ ধুক্ কর্চে কর্ম্ম সম্পদ হারাতে হারাতেও যেটুকু বজায় আছে সেটুকুর হিসাব কর্ত্তে বসে ক্ষমতার পরিমাণ খতাবার সময় মেয়েদের দরকার পড়বে কি না কে বলতে পারে? কেন না যোগ্যতা উৎপন্ন কর্ব্বার সময় আমরা যে আমাদের মনস্তত্ত্ব সঙ্গত পদ্ধতি ছেড়ে অন্যপথ বাছতে যাব তাতো মনে হয় না। অমঙ্গলকে এড়িয়ে চলবার মত অযোগ্যতার হেতু যত কিছু বুঝবো সে গুলোকে কেটে ছেঁটে উড়িয়ে দোবার উৎসাহই আমাদের প্রবল হবে। চলতে চলতে নিকৃষ্টের সঙ্গে মারামারি আমাদের অভ্যাসেই নেই। পথ আগে নিরঙ্কুশ করে নিয়ে তারপর অযোগ্যতাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে থাকলেই যোগ্যতা আসবে, এমনি ধারা সনাতন যুক্তি ছাড়া নূতন কিছুই আমরা ভাবতে পারব না।

মেয়েদের মধ্যে যদি অযোগ্যতার হেতু থাকে তাদের ডাক নিশ্চয়ই পড়বে! নিকৃষ্টকে ঠেকিয়ে রেখে অযোগ্যতাকে উড়িয়ে দেবার কড়া তাগাদা—মেয়েদের উপলক্ষ্য করে বেশ একটা সমস্যা নিয়ে আসবে। তখন সেই সমস্যার কারা সমাধান কর্ব্বে—মেয়েরা নিজেরা করে নেবে না পুরুষরা করে দেবে—

নূতন কতকগুলা অধিকার মেয়েরা পাবে কি মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা আরো কতকগুলো বেশী অধিকার পাবে—এসব চোখ চেয়ে দেখবার। বুঝে ত সব হবে।

আমাদের দেশে মেয়েরা কোথাও মেশে না, কিছু করে না, কিছু যে পারে তাও সর্ব্ববাদী সম্মত নয়—তারা জানেও না কিছু। সবগুলোই অযোগ্যতার হেতু; সুতরাং তাদের এই সমস্ত গুণ নির্ব্বিবাদে যেমন ছিল তা অতঃপর থাকতে পাবে না। পথ নিরঙ্কুশ কর্ব্বার জন্য কেবলি কেটে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হবে। আবার মেয়েরা যদি হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে মর্দ্দানি দেখিয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষা ছেড়ে দেয়, সত্যই যদি এজলাসে মেজেষ্টর হয়ে বসে অথবা দারোগা হয়ে তদন্তে যায়, বৃদ্ধের কিশোরী বধূ তাঁরমুখের বিগত যৌবনের অলৌকিক রূপবৃত্তান্ত অবিশ্বাস কর্ত্তে আরম্ভ করে অথবা কেরাণীর স্ত্রী তিনি সাতটা সাহেবকে ভেড়া করে রেখেচেন সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতে থাকে, তা হলেও নিকৃষ্ট এসে পড়ে, এগুলোকে যেমন করে হোক এড়িয়ে যেতেই হবে।

জেঠাই মা দিদি মা বরং কিঞ্চিৎ লজ্জাশীলা হয়ে আধ ঘোমটা টানা অবস্থায় সভা সমিতিতে রীতিমত একপাশে বসে সাহেবদের যেমন করে হোক বুঝিয়ে দেবেন রাজনৈতিক আন্দোলন মেয়েরাই সজাগ রেখেচে, কলকারখানা হাট বাজার প্রভৃতির এক একটা অন্তঃপুর তৈরী হয়ে বিলাতী ও বিদেশী শিল্পের সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে প্রবল বেগে প্রতিযোগীতা চলবে, কোলের ছেলেটীকে কোলে করে আর তিন চারটীর গোলমাল থামিয়ে প্রকাণ্ড সংসারের হেন্‌শেল ঠেলতে ঠেলতে বৌ ঠাকরুণ একটা রাষ্ট্রীয় সমিতির শাখা গঠন করে ফেলবেন, টুনি পুচি খেদি খোকাকে ধরে মায়ের কাজকর্ম্মে যোগাড় দিয়ে পুতুলের বাক্স বগলে নিয়েই বারোটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত বুড়ো পণ্ডিতের স্কুলে হাজিরা দিয়ে নয় দশ বছর বয়সের মধ্যেই সাক্ষাৎ স্বরস্বতী হয়ে উঠবে ঠিক এম্‌নিটা কে এসে করে দিতে পারে তার অপেক্ষায় পথচেয়ে বসে থাকা অথবা কেমন করে হতে পারে সেই আলোচনায় মাসিক পত্রিকা বোঝাই করে ফেলা যে রাস্তা ধরতে চাইচে তাতে চলে আর আমরা কি কর্ত্তে পারি?

আমাদের বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বে এইত ব্যাপার? মনের স্তর ছাপিয়ে ওপরে ওঠা আমার তপস্যা। হয়ত বোঝা ভুলও হতে পারে তা যদি হয় তবে এ প্রবন্ধকে কৌতুক বলে ধরে নেবেন। তবে নিবেদন অতি সকাতরেই, জানবেন—আপনাদেব মনটা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন।

রাজা-সন্ন্যাসী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

তুমি যে আসিয়াছিলে বসন্তের দুরন্ত পবনে
ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
প্রাণের দারুণ ব্যথা জানাইল অশান্ত স্বননে
সমস্ত আকাশ ;
মুহুর্মুহু দিকে দিকে ছড়াইয়া তপ্ত পথধূলি,
আকুলিয়া প্রাণ,
আসন্ন বৈশাখী মাঝে মিলনের বসন্ত-বিলাস,
করি অবসান,
তুমি যে আসিলে দ্বারে রুদ্ররূপে সন্ন্যাসীর বেশে
হে নব অতিথি,
গৈরিক উত্তরী তব অকস্মাৎ বিতথ পরাণে
জাগাইল ভীতি ;—

তোমার অভয়শঙ্খ বারম্বার অম্বুদ-নিনাদে
গৃহাঙ্গন তলে
আহ্বান করিয়া নিল একে একে সর্ব্বহারা প্রাণ
আপনার বলে,
তোমার পিঙ্গলজটা ভস্মমাখা সর্ব্বদেহে দিল
মেঘের আভাস,
অঙ্গে বিচ্ছুরিত তেজ যেন কাল-বৈশাখীর বুকে
বিদ্যুৎ-বিলাস,
কণ্ঠে-তব হাড়মালা দীনতার আতিশয্যে দুলি,
হে রুদ্র ভৈরব,
দুর্ব্বল আঁখির আগে খুলে দিল আপন গৌরবে
অচিন্ত্য বৈভব !

তোমার নয়ন হ'তে দিব্য দৃষ্টি মেলিয়া চকিতে
করি সাবধানী,
বিলাস-বধির কর্ণে শুনাইলে ওগো মহাপ্রাণ,
কি উদাত্ত বাণী,
ধূলিম্লান জীবনের স্তরে স্তরে ফুটাইয়া ফুল
করুণ ইঙ্গিতে,
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র ভরি দিলে শুধু আত্মভোলা
মধুর সঙ্গীতে,
মোহাবিষ্ট পরাণের অন্ধকূপে হে সাগ্নিক ঋষি,
তব মন্ত্র-লিখা
বিশ্বহিত সাধনার মহাযজ্ঞে জ্বালি দিল আজ
হোমবহ্নি-শিখা !

তখন বুঝিনি আছে শূন্য এই হৃদয়ের মাঝে
তব প্রয়োজন,
রচি নাই অর্ঘ্য তাই করি নাই তোমারে বরিতে
কোন আয়োজন !
শত জন্ম বসে বসে গেঁথেছি যে বরমাল্যখানি
আছে তাহা আছে,
কারে ত পারিনি দিতে বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে
যে এসেছে কাছে,
আমার এ শুষ্ক মালা আচম্বিতে পুষ্পে পুষ্পে
উঠিবে বিকাশি
তুমি যদি পর গলে তব মহা-মহিমায় শুধু
হে রাজা-সন্ন্যাসী !

চিঠির গুচ্ছ

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত]

দুই দফা

(৯)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে নীহার,

তোমার অবস্থা জেনে বড়ই ব্যথা পেলুম। সত্যই ত ও রকম জীবন যাপন করা বড়ই শক্ত ; বিশেষতঃ তোমার আমার মত লোকের পক্ষে, যারা জীবনটাকে একটু বড় করে দেখতে চায়। তোমাদের সমাজের মেয়েরা ছেলেবেলা হতেই ওই ধরণে অভ্যস্ত হয়ে যায় বলেই তেমন কোন অসুবিধা বোধ কেউ করে না। এ কথা পূর্ব্বে তোমায় বলেচি।

এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমাদের সমাজের মেয়েদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? আমার মনে হয় সব চাইতে আবশ্যকীয় বিষয় হচ্চে শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষাপ্রচার কল্পে পুরুষের সহায়তা তোমাদের আবশ্যক, অথচ পুরুষ যদি তোমাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না করে, তা' হলে তোমরা কি করবে? অজ্ঞানতার অন্ধকারের মাঝে চুপটি করে বসে থেকে জীবন কাটিয়ে দেবে? তা' যদি কর, তা হলে আত্মহত্যার সমান-ই পাপে তোমরা লিপ্ত থাকবে।

তোমাদের পুরুষেরা যদি তোমাদের মুক্ত করে দিতে না চায়, তা' হলে তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েদের নিয়ে একটা দল গড়তে হবে, যারা আপনাদের ছোট-খাট দাবী-দাওয়া বিসর্জ্জন করে চিত্তের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে দেশের ভগ্নীদের দুঃখ দূর করবার জন্য। তারা নিজেদের উপবাসী রেখেও মুক্তিরবাণী প্রচার করবে, যার উদাত্ত-স্বর গৃহপ্রাচীর ভেদ করে অন্তঃপুরে আবদ্ধ নারী-দের প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে—তাদের টেনে নিয়ে আসবে, আলোর মাঝে, আনন্দের মাঝে, জীবনের সত্য পথের-ই উপর।

তোমাদের এই প্রচেষ্টা, বিদ্রোহের সামিল বলেই, তোমাদের সমাজ ঘোষণা করবে—পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করচ বলে তোমাদের উদ্দেশে গালি

বর্ষিত হবে। কিন্তু শান্তির ঘুম-পাড়ান গানে তোমরা মুগ্ধ হয়োনা।—ও শান্তির যে কোনই মূল্য নেই, তা আগে তোমায় একবার বলেচি।

আমাদের দেশকে ত তোমরা স্বাধীনতার লীলাভূমি বলেই জান। কিন্তু আমাদের দেশের লোকই কি পরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করবার বাসনা জয় করতে পেরেচে? দাসজাতিকে মুক্ত করে দিয়েচে বলে ব্রিটিশ পুরুষ যখন বিশ্বে আপনার ন্যায়পরায়নতার পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল তখনো আপনার দেশের নারীকে চেপে দাবিয়ে রাখতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেছিল না। নারীর বড় হবার পূর্ণ হবার, আকাঙ্ক্ষা কোনঃ মতে সইতে না পেরে তাদের নির্যাতনই করেছিল। তাই বাধ্য হয়ে জনকত নারীকে পুরুষের আধিপত্য অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। অবিরাম সংগ্রামে তারা সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছিল। আপনাদের শক্তি প্রয়োগে তারা পুরুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, নারী উপেক্ষার সামগ্রী নয়,—খেলবার পুতুল নয়—বিশ্বে তার স্থান ঠিক পুরুষেরই পার্শ্বে।

সত্যের কাছে অসত্যকে চিরদিনই মাথা নোয়াতে হয়—পুরুষের পৌরুষ-গর্ব্বও তাই টিকল না ;—সে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। পুরুষ তোমাদের গতির বিঘ্ন ঘটালে তোমাদেরও এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

বিবাহের পর প্রথম যে চিঠিখানা তুমি আমায় লিখেছিলে, তাতে তুমি আমায় জানিয়েছিলে যে, তোমার ব্যক্তিত্ব তুমি কখনো বর্জ্জন করবে না। কিন্তু আজ তোমার অজ্ঞাতসারে সে ব্যক্তিত্ব যে চাপা পড়েচে, তা কি বুঝতে পারনি? আজ যে নিজেকে গুকিয়ে মারবার কথা তুমি লিখেচ, ওটা কি তোমার দৈন্যের পরিচায়ক নয়? কেন তুমি স্বামীকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ কচ্চ যে, জীবন তোমার দুর্ব্বহ হয়ে উঠেচে?

অত্যাচার যারা করে, তারা যেমন নিজেদের অন্তর দেবতাকে অগ্রাহ্য করে, তেমনি অত্যাচার যারা সয়, তারাও সেই দেবতার অবমাননা করে। এ দুটোই মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে থাকে। তুমি নিজে যে সত্য উপলব্ধি করেচ, কিসের আশায়, কোন প্রলোভনে তা বর্জ্জন করে নিজেকে ছোট করে রাখবে? নিজেকে ছোট করে রাখাকে আমি মনের দাসত্ব বলি। ও ভাব পরিহার করতে না পারলে অন্যকে ত মুক্ত করতে পারবেই না, নিজেকে পর্য্যন্ত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলবে।

পরিবারের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য রয়েচে, তা যদি দ্বিধাহীন হয়ে পালন

করতে পারতে, মিশতে যদি সক্ষম হতে কচি-কচি মেয়েদের সঙ্গে ঠিক সম-বয়সীর প্রাণ নিয়ে, মন খুলে যদি যোগ দিতে পারতে অন্তঃপুরের মহিলা মজলিশে—তা' হলে আমি আজ তোমার কাণে বিদ্রোহের মন্ত্র জপে দিতুম না, কারণ সেইটেই বুঝতুম তোমার সত্যিকার স্থান। কিন্তু তা' না হয়ে তুমি যখন জানিয়েচ যে তোমার বুকে ব্যথা পেয়েচ, তোমার অন্তরের করুণ আর্ত্তনাদ যখন আমার কাণে এসেও পৌঁছিয়েচে, তখন আমি মনে করচি, ওখানে তোমাকে বেশীদিন রাখলে তোমাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করা হবে। যে-টা তোমার কাছে মিথ্যা, জোর করে সে-টা চালাতে চাইলে তোমার জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

বিয়ে করেচ বলেই কেন তুমি অ-কেজো হয়ে যাবে? যে সব মেয়েরা তোমার কাছে এসে সমবেত হয় তাদেরই শিক্ষিতা করে তোল—তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টভাবে মিশতে চেষ্টা কর। তাদের যা বলবার আছে তা' বলে নিঃশেষ করতে দাও। ও সম্বন্ধে আলোচনা না করে তারা থাকতে পারে না—আর কিছুই যে তারা পায়নি! তাদের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হলে, ক্রমে তারা তোমায় তাদের ব্যথার কথাও জানাবে, তখন তুমি যদি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাও, তা' হলেই তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে। তাদের অভাব আছে অনেক, বুকে সঞ্চিত রয়েচে প্রচুর বেদনা—সে-সব ভুলতে তারা তোমারই সাহায্য চাইবে। এমনি করে শেষটায় দেখো তোমার কাজের আর অন্ত থাকবে না এবং সে কাজ সুন্দর ভাবে করতে পারলে তোমাদের নারীর অবস্থা অনেকটা উন্নত হবে।

সত্যিই ভাই, আমার বড় ইচ্ছা করে তোমাদের দেশের এই সব বাল-বধূদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করি—তাদের হাব-ভাব চাল-চলন নিশ্চিতই দেখবার ও জানবার বিষয়।

তোমাদের দেশের যুবকদের সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। আমি শুধু বিস্মিত হই এই ভেবে যে, পুতুলের মত পত্নী পেয়ে কি করে তারা তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে? যৌবন কি পূর্ণতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তাদের চিত্ত নাচিয়ে তোলেনি? সকল রকম বন্ধনের প্রতি কি তাদের আন্তরিক ঘৃণা নেই? এ-সকলের যদি অভাব থাকে, তা' হলে তোমাদের নারীর অবস্থার চাইতে পুরুষের অবস্থা কোন মতেই উন্নত বলা যায় না। প্রাণের স্পন্দন যদি থেমে যায়, তা' হলে সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গ পচে উঠবেই।

ফ্যানি চলে গেছে। তাকে বিদায় দেবার দিন যে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়ে তেমন আমোদ পাইনি।

বাগানের উত্তর কোণের সেই কুঞ্জটা, যেখানে নিরালা বসে তোমাতে আমাতে কত রকমের কথা হোত, সেটা এখন একেবারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েচে—কেউ সে-দিকে যায় না।

আমি মাঝে মাঝে একা গিয়ে সেখানে বসি, সেখানকার গাছগুলো আর ফুলগুলো যেন হাওয়ায় তোমার খবর পেয়ে চুপি চুপি আমায় বলে দেয়। তাদের স্পর্শে আমি আরাম পাই, পুলকিত হই।

আর একটা খবর আছে; সেই যে শুকনো লম্বা পাইন গাছটা, কোনমতে তার কঙ্কাল খাড়া করে করে দাঁড়িয়ে ছিল—যাবার আগের দিন দুপুর বেলায় সেটাকে দেখিয়ে তুমি বলেছিলে—"বুকে এক রাশি আগুন নিয়েও বাইরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেই বেঁচে আছে—" তারও, শুনে তুমি খুসী হবে, দগ্ধ-দেহের সমস্ত কদর্য্যতা দূর হয়ে গেছে ফুলেভরা কতগুলি লতার আলিঙ্গনে। আজ তার বুক দিয়ে আর নৈরাশ্যের হা-হুতাশ বেরুচ্চে না—আজ সেও হেসে হেসে কত ভাবে ভঙ্গিতে বাতাসের কাণে কাণে কত কথাই কয়। একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বুড়োর এই রঙ্গ দেখি।

তোমারই—এভি।

(১০)

স্নেহের ঠাকুর-পো,

সাত বছর পরে বাপের বাড়ী এসেচি, তাই নিয়ম-কানুন ভুলে গিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত কেবল মা আর ভাই-বোনদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্চি। তোমার চিঠির জবাব দিতে সেই জন্যই দেরী হয়ে গেল। নীহারের একা থাকতে হবে শুনে কনক স্বেচ্ছায় কলকাতায় চলে এসেচে। কাজেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তুমি নরেশকে অত ভালবাস বলেই নীহারকে কনক এমন আপন করে নিয়েচে? নীহারের এতটুকু অসুবিধা যেন কনকের বুকে শেল-বেঁধা বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

এখানে এসে তিন দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েচি। তাদের বাড়ী বসে তার দুঃখ-বেদনার কথা কিছুই শুনতে পারিনি—কারণ, তার ভাই-বউরা কড়া পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। কাল গৌরী নিজেই এসেছিল—এর জন্য গঞ্জনা সইতে হবে জেনেও। তিনটে ঘণ্টা একসঙ্গেই ছিলুম—কেমন করে যে সময় কেটে গেল, তা বুঝতেই পারলুম না।

ঠাকুর-পো, নারীর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করচ, কিন্তু কত গভীর, কি মর্ম্মদাহী সে দুঃখ তা কি কখনো উপলব্ধি করেচ? গৌরীর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হতে লাগল, সে যেন তার বুকটা চিরে আমার সামনে ধরেচে—আমি যেন স্পষ্ট করে দেখলুম তার সমস্তটা যায়গা, লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতনের নিষ্ঠুর খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আমি তখনই বুঝতে পারলুম, তার মুখখানি কেন সব সময়েই ছাই-এর মত সাদা হয়ে থাকে—কেনই বা তার ওষ্ঠের বর্ণ নীল আর কেনই বা থেকে থেকে তা কেঁপে ওঠে—তার বুকটা কেন যখন তখন ফুলে ওঠে, আর চোখেই বা অষ্টপ্রহর জল জমে থাকে কেন। সবই আমি এক সঙ্গে বুঝে ফেল্লুম। শুধু বৈধব্যের বেদনা নয় ঠাকুর-পো, তার মনুষ্যত্বের প্রতি নির্ম্মম অবিচার তাকে এমন ধারা জীবনে মরা করে রেখেচে।

এখানে এসে সে তার কোলের ছেলেটীকে যমের হাতে তুলে দিয়েচে। দুনিয়ায় এসে সে বেচারা কেবল তাচ্ছিল্যই পেয়েছিল, তাই যমের আগ্রহ দেখে, তার কাছে সুখে থাকবে মনে করেই, গৌরী তাকে দিয়ে ফেলে স্থির হয়েচে।

এতটুকু কোলের শিশু, তাই দুধ তার রোজই লাগত। গৌরী একবেলা দু গ্রাস যা মুখে দিত, তার ফলে শেষ এই সন্তানটির ক্ষিধে মিটাবার মত দুধ সে নিজে যোগাতে পারত না। সংসারের গো-দুগ্ধের যতটুকু অংশ সে পেত, তাও অতি সামান্য। শেষটায় তাও বন্ধ হয়ে গেল—বুড়ো ছেলেকে আদর করে দুধ খাওয়ালে তার অসুখ হবে, ভাতই তার পক্ষে প্রশস্ত খাদ্য। ভাইদের উপর তার যে কোনই দাবী নেই, তা গৌরী জানত, তাই চুপটি করেই থাকত। কিন্তু শিশুর শরীরে আহারের এই অনিয়ম সইবে কেন?—তার যকৃৎ নষ্ট হয়ে গেল। শিশুর রোগ যখন ক্রমেই বৃদ্ধিপেতে লাগল, তখন গৌরী একদিন অভিমান ছেড়ে বল্লে—"একটীবার ডাক্তার দেখালে হয় না?"

তার মধ্যমভ্রাতা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে জবাব দিলে—"অত বড়মানুষী আমাদের এখানে চলবে না; ছেলে মেয়ের অসুখে ডাক্তার কি করবে?"

মায়ের প্রাণ, তোমরা বোঝনা ঠাকুর পো, এতে কি করে ওঠে। পাতা লতা যে যা বলত, গৌরী তারই রস করে ছেলেকে খাওয়াত, ভাবত তাতেই ছেলে ভাল হয়ে উঠবে। তারই জন্য আবার লাঞ্ছনাও সইতে হোত।

তারপরের কথা, ঠাকুরপো, কাউকেও বলা যায় না। ছেলেটির যখন শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখনো গৌরী বল্লে—"দাদা, কি হবে?" সে প্রশ্নের কোন জবাবই পেলেনা। তারপর সবই ফুরিয়ে গেল।

এই সব দেখেশুনে আমরা যে কত অসহায়। তা না ভেবে থাকতে পারিনে। নারীর বৈধব্য কখন উপস্থিত হবে, তা কে বলতে পারে? আর স্বামীর মৃত্যুর পরই সংসারের সকলে তার সঙ্গে এমনধারা অমানুষিক ব্যবহার করলে পরিজনের শান্তির জন্য সে হৃদয় খালি করে স্নেহ বিলিয়ে দেবে কেন? আর কেনই বা অন্তরের ব্যাথা বুকে চেপে রেখে সে হাসিমুখে সকলের সেবা করবে?

সত্যি ঠাকুরপো, এইসব কথা যখন মনে করি, তখন তোমাদের প্রতি যে মমতা আছে, তা দূরে চলে যায়। কেন তোমাদের আপন মনে করব? এক মায়ের পেটের ভাই যদি এমনধারা পর হয়ে যায়, নাড়ীর টানই যদি এত সহজে ছিঁড়ে যায়, তা'হলে কেন সবার সুখ-সুবিধার জন্য আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত খেটে মরব? তোমরা খেতে দাও, পরতে দাও বলেই কি এত জোর? সে কি তোমরা অম্নিই দাও?

গৌরীর জীবনের একটি ঘটনা, যা তোমায় বল্লুম সেইটেই, একমাত্র ব্যথার কথা নয়; প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে কত অবিচারই সইতে হচ্চে। সে সব এমনি নির্ম্মম যে, গৌরীর দশবছরের ছেলেটিকেও ক্লিষ্ট করে ফেলে। রাত্রিকালে মাকে জড়িয়ে ধরে সেও ফুলে ফুলে কাঁদে। গৌরী তাকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলে। মা আর ছেলের মিলিত উষ্ণ অশ্রুধারা কি একদিন গলিত গৈরিক প্রস্রবণের মত দেশ সমাজ সব পুড়িয়ে দেবে না?

নীহারের চিঠি পেয়েচি। সে লিখেচে, তার কোনই অসুবিধা হচ্চে না। কনক আর সে নাকি সারারাত গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। আমরা ভাল আছি। তোমাদের খবর লিখো।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার—বৌদিদি।

(১১)

নরেশ,

অনেকদিন তোমায় চিঠি লিখিনি। কনকের চিঠি চারপাঁচদিন হ'ল পেয়েচি। সে ভালই আছে তুমি অবশ্য তা জান।

কনকের চিঠিতে অনেক কথাই জানলুম যা এতদিন আমার অজ্ঞাত ছিল। নীহার যে কলকাতায় থেকে মোটেও আরাম পাচ্ছে না, তা সে নিজে আমায় কোনদিন জানায় নি; তবে তার কোথাও যে ব্যথা জমে উঠছিল, তার

চিঠি পড়ে আমি তা বুঝতে পারতুম, যদিও সে বেদনার কারণটা ঠিক ঠিক ধরতে পারিনি। কনক আমায় তা জানিয়েচে। চোখে আঙুল দিয়ে সে আমায় দেখিয়েচে যে, নীহারের প্রতি কি অবিচার আমি করচি।

তোমার মনে থাকতে পারে একদিন আমি বলেছিলুম, পাত্রী নির্ব্বাচনে সুবুদ্ধির পরিচয় তোমরা দাওনি। নীহারকে যে ভাবে আমার অভিভাবকেরা চালাতে চাইছেন, তাতে করে তাকে পীড়ন করাই হচ্চে; যদিও আদর যত্নের এতটুকুও ত্রুটি কিছু হচ্চে না। তাঁরা যে রকম বউ চান, তার জন্য কশিয়াং-এর কন্‌ভেণ্টে যাবার কোন প্রয়োজনই ত ছিল না। বাঙালীর ঘরে ঘরে অনেক মোমের পুতুল আছে, যা কিনতে দামত লাগেই না; অধিকন্তু মোটা হাতে দক্ষিণাও পাওয়া যায়। সেই রকম একটি খুঁজেপেতে নিয়ে এলে, অতি সহজেই সে সংসারের নিয়ম কানুনের সঙ্গে বনিয়ে চলে একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে উঠতে পারত।

শুধু গালি দিলে অথবা দুর্ব্যবহার করলেই যে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়, তা নয়,—তার ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করলেই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষিতা মেয়েদের বধূর আসনে বসাতে যারা ইচ্ছুক, তাদের দেখতে হ'বে যাতে তাদের চিত্তবৃত্তি সম্যক বিকশিত হবার সুযোগ পায়, পরিবারের জমাখরচের খাতা লিখতে শিক্ষিতা বধূর কোন আবশ্যক নেই।

আমি কালই দাদাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েচি যে, নীহারকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই। এ নিয়ে বেশ একটা গোলযোগ বেধে উঠ্‌তে পারে; কিন্তু তাই বলে নীহারের জীবন আমি ব্যর্থ করে দিতে পারিনে।

আমি জানি তুমি আমার কাজের সমর্থন করবে না। বেশী একটু ছিদ্রান্বেষী যারা, তারা এর মাঝে নানা কদর্য্যভাবের আরোপ করতেও বিরত হবে না; কিন্তু এও আমি জানি যে বিবাহ বলি নয়, নতুন জীবনের সূত্রপাত। তাই জেনে বুঝে আমি নীহারের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিতে চাইনে। সংসারের কাজ চলা অনেক পরের কথা আগে নীহারের বাঁচা চাই।

এখানে এলেও নীহার যদি আনন্দ না পায়, তাকে আমি সেইখানেই পাঠিয়ে দেব যেখানে গিয়ে সে আরাম পাবে, তার জীবনকে পূর্ণতর করে গড়তে সক্ষম হবে। তার সঙ্গ হতে বঞ্চিত হলে; ব্যথা আমার খুবই লাগবে সন্দেহ নেই; কিন্তু সে বেদনা আমি সয়ে থাকতে পারব।

তুমি বলবে আমার এই সঙ্কল্প অত্যন্ত অস্বাভাবিক—কিন্তু যেখানে থেকে সে আনন্দ পাবে না জোর করে সেখানে আবদ্ধ রাখাই কি স্বাভাবিক?

* * * *

ওপরের ওই কথাগুলি লিখে ফেলে চুপটি করে খানিকটা সময় বসেছিলুম। কি ভাবছিলুম, জান? ভাবছিলুম তোমার সামাজিক অনুশাসনের শক্তির কথা। বাসরে কি প্রবল তার প্রতাপ! আমি যে তা একেবারে অগ্রাহ্য করতে চাই, তবুও আমার মাঝে এত সঙ্কোচ এনে দেয় যে, তা দূর করতে আমায় জোরের সঙ্গে উপরের কথাগুলো লিখতে হয়েচে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, আমি অন্যায় কাজ করতেই প্রবৃত্ত হয়েছি। যাক্ নীহারকে আমি এখানে আনবই।

বউদির সেই গৌরীদেবীর করুণ কাহিনী তোমায় আগে জানিয়েচি। সম্প্রতি বউদির একখানা চিঠি পেয়ে তাঁর অবস্থা বিশদভাবে জানতে পারলুম। তোমার সমাজের কি এই সব বিধবাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই—ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া ছাড়া? বয়েসয়ে কাজ করবার ছলে কি ঘুমিয়ে থাকাও প্রশংসনীয়?

তুমি বলবে গৌরী দেবীর ইতিহাস একটা ব্যতিক্রম মাত্র। ওর ওপর এতটা জোর দেওয়া সঙ্গত নয়। আমি কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে মোটেই রাজী নই। আমি বলতে চাই, এরূপ অত্যাচার ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হ'চ্চে বলেই, 'ও কিছু নয়' বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি। দাদা ওই কথা বলেই বউদিকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

বিধবাদের সম্বন্ধে কলেজে পড়বার সময়, তোমাতে আমাতে খুব আলোচনা হোত। তুমি বলতে, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করে সমাজ এই কথাটাই আমাদের বুঝিয়ে অথবা শিখিয়ে দিতে চায় যে, দুনিয়ায় যৌন সম্বন্ধটাই সব চাইতে বড় নয়—ও সম্বন্ধ ঘুচে গেলেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আছে। বাংলার বিধবারা ওই সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করচে। জানিনা, এ মত তুমি এখনও পোষণ কর কিনা।

আমি কিন্তু আগের মত এখনও বলব যে, যৌন সম্বন্ধটা সব চাইতে বড় না হলেও—ওর শক্তি খুবই বড় এবং ওকে উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আত্মরক্ষা ও বংশ বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রাণী মাত্রেরই আছে। মানুষ যে প্রাণী সে কথা অস্বীকার করা যাবে না—যদিও আমরা

প্রাণী কিনা, প্রাণের পরিচয় পাইনে বলে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা জড়ের সামিলই হয়ে পড়েচি, তাই আমরা মনে করতে পারি যে, পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নারীর প্রাণ-পদার্থটাও পাথরে পরিণত হয়—না হওয়াটাই অস্বাভাবিক, গুরুতর অপরাধ।

বাসনা-কামনা প্রভৃতি বর্জ্জন করতে শুধু বিধবাদেরই উপদেশ দাও কেন? তা'রা ত তোমাদের মতে অবলা—তাদের ত কেবল পরের গলগ্রহ করেই রেখেচ; এমন অবস্থায় সংযমে শক্তিশালিনী হয়ে, তারা তোমাদের কতটুকুই বা হিতসাধন করবে? আর নারীকে কি কাজ করবার অধিকার কিছু তোমরা দিয়েচ?

তোমরা, পুরুষেরা, যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত রয়েচে, তারা কেন সংযমে শক্তিমান হয়ে বিশ্ব-মানবের মুক্তিদান করতে যত্নবান হও না? তাহলে কাজ ত অনেক সহজ-সাধ্য হয়ে ওঠে।

তোমরা তা পার না এবং পার না বলেই সংযমের সবটা বোঝা বিধবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় এড়িয়ে বসেচ—আর নিজেদের বেলায় বিবাহটা করেচ পুত্রার্থং।

একটা গল্প তোমায় বলিনি—আজ মনে পড়ে গেল। প্রথম চাকরী পেয়ে যখন লাহোরে আসছিলুম, সেই সময়ের কথা। তোমরা ত হওড়া ষ্টেশনে আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলে। ট্রেণ ছেড়ে দিলে মনটা ভারি খারাপ বোধ হচ্ছিল—অমন যে তুর্গিনেভের গল্প-কাব্য তাতেও মন বসছিল না। বইখানা হাতে করে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিলুম। পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি ভদ্রলোকের কাশির আওয়াজে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে বাতাস পেয়ে তার লম্বা পাকা দাড়ি, তাকে ভারি বিব্রত করে তুলেচে। আমি ফিরতেই তিনি উড়ন্ত দাড়ী-গুচ্ছ বাঁ হাতে গুছিয়ে নিয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"মশাই, কোথায় যাবেন?" জবাব দিতেই তার প্রশ্নের বান ছুটল। শেষটায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বিবাহ হয়েছে?"

আমার একটু ভয় হোল। এতদিন ফাঁকি দিয়ে অবশেষে দেশ ছেড়ে যাবার পথে একটা ঘটক এসে তেড়ে ধরল! একটু অস্বাভাবিক রুক্ষস্বরে আমি বল্লুম—"আপাততঃ ও দিকে খেয়াল নেই—বেশ আছি।"

ভদ্রলোকের চোখ-দুটো যেন জ্বলে উঠল। তিনি আমার ডানহাতের

পাতা ধরে খুব খানিকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বল্লেন—"এই ত চাই—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া জীবনে কি সিদ্ধিলাভ করা যায়?"

আমি একটু স্তম্ভিত হয়ে তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি এমন একটি বক্তৃতা জুড়ে দিলেন, যা শুনলে তোমরা তাঁকে অতি সম্মানের সঙ্গে নিয়ে তোমাদের ধর্ম্মসভার আসনে বসাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতে।

গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছিলে আমি কিছু খাবার কিনতে নেমে পড়লুম। ফিরে গিয়ে দেখি সেই ব্রহ্মচর্য্যের পাণ্ডাকে ঘিরে জনকত নতুন যাত্রী বসেছেন—তাঁর বক্তৃতা তখনো থামেনি। টিফিন ক্যারিয়্যারে খাবার গুলো পুরে রেখে আমি আবার যখন তুর্গিনেভ খুলে বসলুম, তখন ভদ্রলোকটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখিয়ে বল্লেন—"এই দেখচেন একজন কলেজের অধ্যাপক—এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নি এবং করবেনও না। এঁর মত সংযমী, ত্যাগী শত শত যুবক না হলে আমাদের দেশের দৈন্য ঘুচবে না—হিন্দুর সেই গৌরবের দিন আর কখনো ফিরে আসবে না।"

তিনি থামতেই আমি বল্লুম—"আপনি ভুল বুঝেচেন—বিয়ে কখনো করব না, এমন কথা ত আমি বলিনি।"

তবুও নিষ্কৃতি নেই। তিনি অম্নি জবাব দিলেন—"তা কি আমি বুঝিনি? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, নইলে আপনার পূর্ব্বপুরুষদের যে পিণ্ডলোপ হবে। আপনার চরিত্রে এইটেই শিখবার বিষয় যে লালসার বশবর্ত্তী হয়ে আপনি বিবাহ করবেন না—করবেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

তাঁর বক্তৃতা সমানই চলতে লাগল। আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা যে আগাগোড়া ভুল তা আমি তাঁকে বোঝাবার জন্য দু'একবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু তা' তাঁর কাণেই পৌঁছিল না; অগত্যা আমি নিরস্ত হলুম।

তিনি অপর একটি ভদ্রলোককে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লেন—"মশাই, ত্রিশ বৎসর যাবত স্কুলে শিক্ষাদান করবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেবার চেষ্টা সব সময়েই করেচি; কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব মশাই, কত ছেলে পাশ করে বেরিয়ে কত উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েচে—কিন্তু মানুষ হলো না একটিও! হবে কি করে মশাই?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।"

যাঁকে এ সব বলা হচ্ছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

"আজ্ঞে, রাণীগঞ্জে।"

"রাণীগঞ্জে কোথায় যাবেন বলুন ত ?" অপর একজনে জানতে চাইলেন।

"হরনাথ চাটুজ্জের বাড়ী।"

"বটে! তিনি আর আমি যে এক আফিসেই চাকরী করি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"আজ্ঞে আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেচি।"

"বটে, বটে!" রাণীগঞ্জের ভদ্রলোকটি কিছুকাল চুপ করে থেকে বক্তা মহাশয়ের আপাদ মস্তক বার বার করে দেখতে লাগলেন। তারপর সহসা বলে ফেল্লেন—"আপনার এটি দ্বিতীয় পক্ষ না ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বলেন কি মশাই, ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে এতটা বক্তৃতা করলেন আপনি!" পার্শ্বের আর একটি ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বল্লেন।

বক্তাটি তাঁর লম্বা দাড়ীর মধ্যে হস্তচালনা করতে করতে বল্লেন—"বলেচিইত মশাই, লালসার জন্য বিবাহ, আর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধে বিবাহ, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—"

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে রাণীগঞ্জের ভদ্রলোকটি বল্লেন—"কিন্তু শুনেচি মশাই, প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েও আপনার আছে ?"

"আজ্ঞে, দুটি কন্যার বিবাহ দিয়ে অব্যাহতি পেয়েচি। একটিমাত্র ছেলে, যদি কোন অমঙ্গল হয়, তা'হলে পূর্ব্বপুরুষদের পিণ্ডলোপ হবে না ? আপনারাই বিচার করুন, একটি মাত্র গুঁড়ো বইত নয়—তার ভরসায় কি থাকা যায় ?"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আমি বইপড়ায় মন দিলুম। ট্রেণ কখন রাণীগঞ্জ পিছনে ফেলে এসেছিল, তা টেরও পেয়েছিলুম না।

তুমি ভাবচ তোমাকে চটাবার জন্যই আমি এই গল্প লিখলুম। তা কিন্তু মনে করোনা—আমি নিজে দেখেচি, শুনেচি।

আশা করি ভাল আছ। তোমাদেরই—মোহিত।

(১২)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে এভি,

ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা, এভি! স্বামী আমায় কি লজ্জায়ই না ফেলেচেন। তিনি তাঁর দাদাকে লিখেছেন যে আমাকে তিনি লাহোর নিয়ে যেতে চান।

তুমি বলবে, বেশ করেচেন। তুমি বোঝনা, তোমাদের সমাজ অন্য ধরণের—আমাদের অভিভাকেরা একে বিষম বেয়াদবী বলে মনে করেন। আমি আজ শ্বশুরের মুখের দিকে চাইতে পারচিনে।

এ সব অনর্থের মূল হচ্চে কনক—স্বামীর বন্ধু-পত্নী। এমন একটা কাজ করে ফেলেচে আমাকে না জানিয়ে। আগে বুঝতে পারলে আমি তাকে আমার অন্তরের ব্যথার কথা বলতুম না। আমার মোটেই মনে হয়নি যে, সে স্বামীকে জানাবে। আমার এখানে একা থাকতে কষ্ট হবে বলে, সে বর্দ্ধমান হতে এসেছিল। এখন দেখচি তার না আসাই ছিল ভাল। এর জন্য তাকে আমি সহজে ক্ষমা করতে পারচিনে। আজ সারাদিন তার সঙ্গে আমি কথা কইনি—কেবল একটু আগে রাগ করে তার ঠোঁট দুটো চেপে ধরেছিলুম—এমন লাল হয়ে উঠেছিল যে, আমার ভয় হচ্ছিল পাছে আমার হাতশুদ্ধ রাঙিয়ে দেয়। সে কিন্তু তবুও আমার গলা জড়িয়েই দাঁড়িয়ে রইল। আর কঠোর হতে পারলুম না—বুকে চেপে ধরলুম। কিন্তু কি কাণ্ডই সে ঘটিয়েচে।

দিদিই বা শুনে কি মনে করবেন। সাত বছর পর একটি মাসের জন্য বাপের বাড়ী গিয়েছেন, আর তাতেই এত সব। কনককে দিয়ে আমি চিঠি লিখিয়ে ছেড়েচি যে, এসব তারই দুষ্ট বুদ্ধির ফল—আমিও তাই লিখেচি।

আর কনকের-ই বা কি দোষ ? সে আমায় খুব বেশী ভালবাসে বলেই না আমার ব্যথায় ব্যথিতা হয়েচে এবং তারই জন্য স্বামীকেও জানিয়েচে। সে কি করে বুঝবে যে, এতেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ওপর তাগিদ ওয়ারেণ্ট জারি করে বসবেন, তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবার জন্য। স্ত্রীটি যেন তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

এই দেখনা ব্যাপার! নারীর অধিকারের জন্য যারা মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাফিয়ে বেড়ায়, তারা নিজেরাই নারীর মর্য্যাদা বোঝে না। এদের ক বিশ্বাস করে, এদের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চল্লে, শেষটায় কি ভয়ানক পরিণতি হবে বলত ?

তোমার কথাই ঠিক, এভি! পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আমাদের লাভ নেই। পুরুষের চোখ দিয়ে আমরা নিজেদের অভাব দেখতে চাইব না। আমাদের বুকের ব্যথা তারা কি করে জানবে, বুঝবে ? আমাদের অন্তর দেবতারই আদেশে আমরা পরিচালিত হব।

আমি আজ স্বামীকে লিখে দিয়েচি যে, আমি লাহোর যাবনা। সঙ্কল্প করেচি, এখানে থেকেই, যে সব মেয়েরা প্রায় রোজই আমার কাছে আসে, তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করব। আমার শোবার ঘরটাকে একেবারে ক্লাসরুমের মত করে সাজিয়ে ফেলেচি—মেয়েরা এসে দেখে অবাক হয়ে যাবে।

বুড়ো পাইন গাছটার নব-যৌবন প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে সত্যিই বড় খুসী হয়েচি। আকাশে বাতাসে সে জীবনের আনন্দ-সংবাদ পেয়েছিল বলেইত নৈরাশ্যের জড়তাকে দূরে রাখতে পেরেছিল। আজ যে তরুণ-ব্রততীর সংস্পর্শে সে আনন্দে মেতে উঠেচে, তার কারণ হচ্ছে, বার্দ্ধক্যের ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছিলনা। জীবনের গূঢ় রহস্য ওর যেন জানা ছিল।

আমি ভাবি মানুষের সঙ্গে এদের কি আশ্চর্য্য পার্থক্য। মানুষ কেবল জড়তাকেই খুঁজে বেড়ায়, দুঃখ-দৈন্যকে বড় করে দেখে দেখে নিজেকেই ছোট করে ফেলে, মৃত্যুকে সর্ব্বদাই আসন্ন জেনে অতি সহজেই তাকে বরণ করে নেয়—অথচ এই মানুষই নাকি ভূমার পরিচয় পেয়েচে—বিশ্বের মূল সত্য উপলব্ধি করেচে।

আমি কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হতে দেখেচি, কত শীর্ণা স্রোতস্বিনীর বুকে তরঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেচি, ছিন্ন মেঘ-খণ্ডের চটুল নৃত্য-ভঙ্গিতে বিস্মিত মুগ্ধ হয়েচি—কিন্তু কখনো পক্ককেশ লোকের অধরে হাসির মাধুরী দেখিনি, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টিতে তেজের পরিচয় পাইনি, শুকনো বক্ষপঞ্জরের ভিতর জীবনের রাগিনী শুনিনি। পক্ষান্তরে উপলব্ধি করেচি, বাইরে বিরাট সাজ-সজ্জার ভিতরে দারুণ দৈন্য, মোহন আঁখি-তারকায় বেদনার ব্যঞ্জনা, স্ফীত বক্ষের মাঝে নৈরাশ্যের হাহারব।

তুমি যাই বল এভি, আমার বিশ্বাস, মানুষ প্রাণকে খুঁজে পায়নি। যদি পেত, তা' হলে এত সহজে ও-পদার্থকে তারা হারিয়ে বোসত না—ও-কে বেশ করে, আরামের সঙ্গে, ও-র সবটুকু আনন্দ নিংড়ে উপভোগ করে তবে ছাড়ত।

আমরা, মানুষেরা, কিছুতেই তা পারচিনে। আঘাতের ব্যথা ভুলতে আমাদের বড্ড বেশী সময় লাগে। অনেক সময় আঘাত-জনিত ক্ষতটাকে বাড়িয়ে তুলেই আমরা নিজেদের মৃত্যুকে কাছে টেনে আনি, আর মৃত্যু যতদিন না এসে পড়ে, ততদিন জীবনের আনন্দকে দূরে রাখবারই চেষ্টা করি। জীবনের এই নিরানন্দই আমাদের বুকের মাঝে নৈরাশ্য জমিয়ে তোলে—তাই অ-কাজ

যে যৌবন চলে যায় তাকে আর ফিরে পাইনে। জীবনে নব বসন্ত এসে আর কখনো আমাদের পুলকিত উন্মত্ত করে তোলেনা, অন্তরের শুকনো কুঞ্জে কোকিল দোয়েল সুরের ঢেউ খেলিয়ে দেয় না।

এ সব কথা যে আজই কেবল আমার মনে হচ্চে, তা নয়—ছুটির দিনে নিস্তব্ধ দুপুরে জানালার ধারে বসে যখন বুড়ো পাইন গাছটা আর তার জ্ঞাতি-গোষ্টিদের দিকে চেয়ে দেখতুম, তখন আমার কেবল এই-সব কথাই মনে হোত।

বাড়ীতে, শুনচি, আমাকে লাহোর পাঠাবার কথা নিয়ে খুবই আলোচনা চলচে। দেখি কি হয়! খুব লম্বা চিঠি দিয়ো। ইতি

তোমারই—নীহার।

নারায়ণের-পঞ্চপ্রদীপ

সহজিস্ত্রা

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

চতুর্থ অধ্যায়

(ত্রিবেণীর কথা)

১

সরস্বতী

হাসির আমার এ কি হল! সে এই মাস-খানেকের মধ্যে এমন হয়ে গেল কেন? মা ভাবছেন, দিদিমা কাঁদছেন, এমন কি বোধ হচ্ছে যেন বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভাবছে যে এই সারা গ্রামখানার হাসিখানি এমন হয়ে একটা ছোট্ট ঘরের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? এমন কি এই হতভাগিনী বাকশক্তিহীন মানুষটাও যে মূক দৃষ্টিতে জানাচ্ছে যে তার করুণাময়ী হঠাৎ তার প্রতি এমন অকরুণ হয়ে উঠল কেন? কেবল ঘরের কোণে বসে একটা ছবি নিয়েই ভাবছে, না হয় তুলি বুলুচ্ছে, না হয় হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে।

ছবিখানাও দেখছি—একটী ভিখারীর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কত ফুল, কত শোভা, কত হীরে মাণিকের রাশি হেলা ফেলা করে সাজান। কিন্তু তার মাঝখানে গৈরিক বসনে ভিক্ষাপাত্র হাতে একজন ভিখারী। এ যেন সেই তার পূর্ব্বের আঁকা বুদ্ধদেবের ছবিখানার নতুন সংস্করণ। সেই বুদ্ধের ছবিখানা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে, আর দেখতে পাই নে। কিন্তু তার স্থানে এ কার মূর্ত্তি সে আঁকছে। এ মুখখানার সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য রয়েছে তাঁকে এমন সন্ন্যাসীর বেসে সাজিয়ে দেবার কি কারণ যে আছে তাও ত' খুঁজে পাই নি। প্রিয় বাবুর চেহারার মধ্যে কোন স্থানেও ত' সন্ন্যাসীর লক্ষণ আমি দেখতে পাই নি। তবে আমি তাঁকে অধিকাংশ সময় দূর হ'তে না হয়, আড়াল থেকে দেখিছি, তাই জোর করে বলতে পারি নে বটে, কিন্তু কৈ আর কাউকেও ত' এ রকমের কোনো কথা বলতে শুনিনি। তবে শুনিছি বটে ইনি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান লোক। তাই বলে এঁর মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাব কি করে হাসি দেখলে?

প্রিয়ব্রত বাবু যে খুব ভাল লোক তাত' সবারই মুখে শুনছি। শুনছি তিনি আসাতে গ্রামের শ্রী ফিরে গেছে। সারা দেশের লোক এঁর প্রশংসা করছে—সমস্ত গ্রামের হেন কাজ নেই যাতে নাকি এঁর হাত নেই। গ্রামের দুঃখী দরিদ্ররাও নাকি বেশ দু'পয়সা রোজগার করে এঁর সাহায্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় করে নিচ্ছে। তবু কেউ ত' বলেনা যে ইনি সন্ন্যাসী। মা বলেন বটে, যে ম্যানেজার বাবু খুব ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচারী, স্বল্পভাষী, স্বল্পব্যয়ী মানুষ। বিষয় বুদ্ধিও শুনেছি তাঁর যথেষ্ট আছে—বিষয়ের আয়ও বেড়েছে। কিন্তু কেউ ত তাঁকে কৈ সন্ন্যাসী বলে না, বা সন্ন্যাসী বলে ভুল করে না? তবে সেই বিষয়ী মানুষটীর মধ্যে এই অদ্ভুত মেয়ে মানুষটী সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখতে পেলে?

সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী—কেবল দেখেছিলাম সেই এক দিন, আর দেখছি এই এতকাল পরে আমার ঘরের দ্বারেরই কাছে। জানি না আমার কি সৌভাগ্য যে আমাদের সেই কতদিনের হারাণো চাঁদ আবার আমারই অদৃষ্টে দয়া করে উদয় হয়েছেন, দয়া করে ধরা দিতে এসেছেন।

ধরা দিতে? হায় রে মেয়ে মানুষের প্রাণ! এ কথা কেমন করে, কোন্ সাহসে তুই বল্লি? কৈ তিনি ধরা দিলেন? সেই যেমন প্রথম ধরা দিতে এসে ধরা না দিয়ে সরে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করেই ত' আজও কাছে

এসে ধরা নিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন। এখন যে ইনি আরও দূরে—বহু দূরে কোন সপ্তর্ষি লোকের ধ্রুবতারার মধ্যে লীন হয়ে আছেন। আমার যোগী যে ধ্রুবলোক হতে নামতেই পারেন না। না—না—নেমে কাজ নেই। তুমি অমনি ধ্রুবলোকেই থাক, আমিও এই অধ্রুবের জগৎ হতে তোমার ঐ দুটী বিশাল কোমল নয়নের মধ্য দিয়ে আমার ধ্রুব ভক্তিকে সেই লোকে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু হাসিই বা এ কি করে বসল? হাসি এ কোন্ অপরিচিতকে এনে আমাদের দুই বোনের মাঝখানে দাঁড় করালে। এ কে কে চায়? আমি? কৈ একদিনও ত' এঁর শুভাশুভ কোন কর্ম্মের দিকে ফিরে চাইবার কোনো অবসর পাই নি, তবে কেন আমার এত কাছে, আমার হাসির হাসিটুকুর অন্তরে এঁর স্থান হল? হাসি এ কি করে বসল?

তাকে মানা করবার জো নেই। মানা করলে বলে, 'আমার বাবা ক্রিশ্চান হয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি ঘরে থেকেই ক্রিশ্চান। আমি তোমাদের এই সব বাজে লোকাচার মানি নে।' সে বাস্তবিকই কোন দিন কোন মিথ্যে সংকোচ রাখে নি, যখন যেখানে যাবার দরকার বোধ করেছে সেখানে গিয়েছে, যে কাজ করবার দরকার বোধ করেছে তাই করেছে। কেউ তাকে বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি। সে তার হাসির জোরে সমস্ত বাধাই উড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাকে কে ঠেকাবে? আমি? আমার সে সময় কৈ? ইচ্ছে কৈ? শক্তি কৈ? আমার সমস্ত শক্তিই যে এক জায়গায় আটকে গিয়ে শিবের জটায় গঙ্গার মত পাক খাচ্ছে। কোন্ ভগীরথ তাকে আরাধনা করে নামিয়ে আন্‌বে?

* * * * * * *

আজ প্রভাতে আমার সন্ন্যাসীর পাশে এ কাকে দেখে এলাম! এ কে—এ কে—এ কে গো! একে দেখলাম যেন আমার হোমাগ্নির পাশে শান্তিজলের কলসের মত চুপ করে শেষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! কে ইনি যাকে আমার সন্ন্যাসী এত আগ্রহে নিজের বুকের মধ্যেই টেনে নিচ্ছিলেন? কে তুমি এত দিন আপনাকে এমন ভাবে গোপন করে রেখেছ? তোমায় ত' চিনতে পারলাম না। তুমি আমাদের দাসত্ব করতে এসেছ, কিন্তু তোমার ঐ দাস ভাবের আবরণের মধ্যে যে মহাপ্রভুত্বের আভাস হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝলক মারলে তা কি সত্য, না তাও একটা মিথ্যা আলেয়ার আলো? যদি ঐ

আলেয়া হয় তা হলে অভাগিনী হাসি মরেছে, আর যদি আলেয়া না হয়ে ধ্রুব জ্যোতিঃ হয় তা হলে? তা হলেও না জানি তার কি হবে?

যা ভয় করছি, যদি তাই হয়; তা হলেও ত তুমি সহজলভ্য নও। হে অপরিচিত, হে আবৃত জ্যোতিঃ, তোমার সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ ক'র, নইলে যে আমরা ভয়ে মরি। নইলে অভাগিনী হাসির হাসি যে আর দেখতে পাব না।

কথা কও—কথা কও! আজ আমার শুধু কথা শুনবার ইচ্ছে করছে—কথা কও! হে চিরমৌন, আর কত কাল এমনি ভাবে শুধু একটী কথার আশায় বসিয়ে রাখবে, কথা কও। এত কথার জগতে, এত কোলাহলের হাটে, শুধু সেই একটী কথাই কি কেবল শুনতে পাব না। আর সবই শুনতে পাব কেবল সে একটী কথা হ'তে তুমি আমায় বঞ্চিত রাখবে? প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হ'তে প্রভাত—এমনি করে কত রাত্রি, কত দিন কেটে গেল, কত কথা তুমি কইলে, কেবল সেই একটী কথা হ'তেই বঞ্চিত রাখলে! বঞ্চিত রাখবে বলেই কি আগে হ'তে এই বাক্যহারা মেয়েটীকে আমাদের মাঝে রেখে দিয়েছ? তাই সেই প্রথম দর্শনের দিনই তোমার চিরমৌন ভাষার প্রতিনিধি করে এই যাকে পাঠিয়েছ তাকে বুঝি কথা কহাতে পারলাম না।

কিন্তু আমিও ছাড়ব না, আমি একেও কথা কহাব। একেও একদিন তোমার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেখাব যে আমি কহাতে জানি, মৌনতার মধ্যে মুখরতার জন্ম দিতে পারি। চির স্তব্ধ আকাশেও ধ্বনি জাগাতে পারি। ব্যথা আমার কথা কইবে এবং সেই সঙ্গে তুমিও কইবে—নিশ্চয়ই কইবে। যে কথার জন্য আমি আমার জন্ম হ'তে প্রতীক্ষা করে আছি, যে কথার জন্য আমার জনক ঋষি সারা জীবন অপেক্ষা করে গেছেন, সে কথা যে চিরদিন অকথিত থাকবে এ হ'তেই পারে না। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হ'তে পারে না—তাঁরই আশা আমার মধ্যে জলন্ত হয়ে জেগে আছে। সেই অমর আশার অমর আশা অমর সাফল্যকে টেনে আনবেই। আমি তার সূচনা দেখতে পেয়েছি।

* * * *

আমার 'ব্যথা' আমার হাসির ব্যথা, এই মুখর সংসারের মৌন মূক 'ব্যথা'ও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন তার মৌনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি জেগে উঠেছে। কেন উঠেছে তাও ধরতে পেরেছি, কারণ তার হাসি আর তাকে তেমন করে প্রাণভরা হাসি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছে না। কিন্তু তার

চোখে এত দিন পরে জল দেখতে আরম্ভ করিছি—সে কেঁদেছে। আমি তাকে ভাষা শেখাবার বিফল চেষ্টায় যতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, সে ততই মৌন অশ্রুভরা চোখে তার হাসির জন্য মিনতি জানাতে আরম্ভ করেছে। যদি এই মৌন ভাষা স্ফুট হয়—এই এত দিনকার চেষ্টার ফল দেখা দেয়, যদি সে হঠাৎ তার স্ফুট ভাষা খুঁজে পায়, তা হলে কি সে যার মৌনতার প্রতিনিধি, সে কথা কইবে না?

কিন্তু তুমি ত' কথা কইতে পার, তোমার বন্ধুর কাছে ত' দূর হ'তে দেখলাম কত কথাই না কইছ! কেবল আমিই বঞ্চিত থাকব? আমার কাছে কি কেবল শুষ্ক উজ্জ্বল তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার নেই তোমার? যে কথা বলবার জন্য তোমার সমস্ত দেহ মন আত্মা ছটফট করছে—হ্যাঁ করছে, নিশ্চয় করছে—সেই কথাটাই কেবল বাদ থেকে যাবে? তুমি কি মনে করেছ আমার কেবল কাণ দুটোই আছে, চোখ নেই, মন নেই, আর কোনো ইন্দ্রিয় নেই? আমি যে তোমার কতখানি দেখে নিয়েছি, তাই যে তুমি ধরতে পারছ না। তোমার যোগযুক্ত মন যেখানেই যুক্ত থাক, তোমার মনের মন যে কোথায় ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্ছে তা তোমার চোখে পড়ছে না, এইটেই আশ্চর্য্য!

কিন্তু আমার যোগীর এই ভোগী বন্ধুটিকে কেমন যেন একটু ভয় করছে। কি যে কথা হয় এঁদের মধ্যে তা যে কোন দিন সাহস করে আড়াল থেকে শুনতে পারলাম না! আড়াল থেকে শোনা! ছি ছি, তা কেমন করে পারব? তা যেদিন পারব সেদিন কি আর আমার সন্ন্যাসীর কাছে আমার চির-প্রার্থিত রঘুনাথজীর কাছে যেতে পারব না? না—না, তা পারব না। যদি চিরদিন এই দু'জনের পরিচয় গোপন থাকে, তবু তা পারব না।

কিন্তু এক একদিন ইচ্ছা হয় প্রিয়ব্রত বাবুর মার কাছ থেকে, আর যদি সম্ভব হয় অবিনাশ বাবু উকিলের কাছ থেকে এঁর পরিচয় আদায় করতে যাই। কিন্তু পারি না যে। কে যেন বাধা দেয়। তাই হাসির কাছেও এ কথা পাড়তে পারি না। লজ্জা করে—! লজ্জা! আমার আবার এ উৎপাত কোথা হতে জুটল! যে কোন দিন কোন লজ্জা ভয়ের ধার ধারেনি, তার আবার লজ্জা!

কিন্তু তবু সেই লজ্জাও ত' আমার মধ্যে লুকিয়ে এসেছিল। এতদিনকার অব্যবহারেও ত' সে মরে নি।

বুঝি কিছুই মরে না ; এই অমরতার জগতে কিছুই মরে না। কালে সবই ফুটে ওঠে, সময় হলে সবই আবার ফুলে পাতায় সজীব হয়ে ওঠে। ওরে মন ! ভয় নেই, সময়ের অপেক্ষা কর্, তোর সাধনাও সফল হবে। (ক্রমশঃ)

(উপাসনা, শ্রাবণ।)

তুমি

[শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।]

তুমি শান্তি আমার তাপিত পরাণে
শয়নে স্বপন সুখ।
তুমি হৃদয়-কুসুমে স্নিগ্ধ মধুর
অমিয়-সুরভি টুক ॥
তুমি মলয় আমার প্রখর নিদাঘে
মধুমাসে পিকবর।
তুমি তরুণ তপন প্রভাতে আমার
সন্ধ্যায় সুধাকর ॥
তুমি জ্যোছনা আমার আঁধার হৃদয়ে
অন্ধের হাতে নড়ি।
তুমি নিরাশ জীবনে আশাটী আমার
অকূল পাথারে তরী ॥
তুমি হৃদয় সাগরে লহরী আমার
বিষাদের মাঝে হাসি।
তুমি সুপ্ত জীবনে বাঁশরী আমার
নিয়ত জাগাও আসি' ॥
তুমি ক্লান্ত হৃদয়ে আরাম আমার
প্রেমের মধুর স্মৃতি।
তুমি উদাস জীবন-প্রান্তরে মোর
অন্তর-ভরা গীতি ॥

আগমনী

[রচনা—শ্রীকালিদাস রায়]

সুর ও স্বরলিপি

[শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ভৈরবী—জলদ্ একতালা

০ ১ ২´ ৩
II {দা র্সা র্সা। ণা র্সা ণা I দা ণা দা। পা দা পা।
এ স মা ন ব নী হৃ দ য়া জ ন নী

০ ১ ২´ ৩
। মা জ্ঞা জ্ঞা। -ঋা সা সা I দ্‌া -ণ্‌া সা। সা -া -া।
ম ণি ম ঞ্জু ষা- ক ০ ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা সা সা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা মা। মা মা মা।
হ র ষ ধা রা য় স র স ক রি য়া

০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা মা পা। দা দা ণা I দা -ণা -র্সা। র্সা -া -া}II
এ স মা ব র ষ প ০ ০ রে ০ ০

০ ০ ১ ২´ ৩
{স সা II ণ্‌া সা সা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I মা মা মা। মা মা মা।
(১) এ স শা র দ গ গ ন ম গ ন ক রি য়া
(৫) এ স প য় স্বি নী ০ র আ পী ন ভ রি য়া
(৯) এ স ন দ ন দী ভ রি মী ০ ন বৈ ভ বে
(১৩) এ স শি শু র আ ০ স্য হা ০ স্যে ভ রি য়া

০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা মা পা। পা পা দা I মা -পা -দা। দা -া -া।
(১ক) শু চি জ্যো ছ না র বা ০ ০ নে ০ ০
(৫ক) ম ধু র গো র স র ০ ০ সে ০ ০
(৯ক) কান্ তা র ভ ০ রি কা ০ ০ শে ০ ০
(১৩ক) লা ০ স্যে আ ঙি না ভ ০ ০ রি' ০ ০

```
                    ১         ২´          ৩
। দা  দা  র্সা । -া  র্সা  র্সা I দা  দা  ণা । ণা  ণা  ণা ।
(২)   ব   ন   প্রা  ন্   ত   রে   হ   রি   ত   অ   রু   ণ
(৬)   নিঃ  স্বে  র   ০   গৃ   হ   শ   ০   স্তো  ভ   রি   য়া
(১০)  ত   রু   ল   ০   তা   ভ   রি   ফ   ল   গৌ   র   বে
(১৪)  ন   ব   স্বা  স্   থ্যে  ভ   রি   য়া  শী   র্ণ  অ   ঙ্গ

   ০                ১         ২´          ৩
। জ্ঞা  জ্ঞা  মা । মা  হ্মা  মা I জ্ঞা  -া  -ঋা । সা  -া } I
(২ক)  ঘ   ন   ত   রু   ণি   মা   দা   ০   ০   নে   ০
(৬ক)  বি   শ্ব   ০   ভ   রি   য়া   য   ০   ০   শে   ০
(১০ক) ত   ড়া   গ   ভ   রি   য়া   হাঁ   ০   ০   সে   ০
(১৪ক) জী   র্   ণ   জ   ড়   তা   হ্   ০   ০   রি   ০

                    ১         ২´          ৩
{ ম  মা I জ্ঞা  মা  দা । দা  ণা  ণা I দা  -ণা  -র্সা । র্সা  র্সা  র্সা ।
(৩) এ  স  প্র  ক  টি  য়া  তা  রা  পু  ০  ঞ্  জ  এ  স
(৭) এ  স  পুষ্  প  ভ  রি  য়া  গ  ০  ০  ন্  ধে  চা  রু
(১১)ভ  রি  শা  লি  সম্  প  দে  ক্ষে  ০  ০  ০  ত্র  স্নে  হ
(১৫)মা  গো  বি  ত  রি  অন্  ন-  স্ত  ০  ০  ০  ন্য  ক  র

   ০                ১         ২´          ৩
। জ্ঞর্া  জ্ঞর্া  জ্ঞর্া । দা  দা  -া I মা  -দা  -ণর্সা । র্সা  -া  র্স  র্সা ।
(৩ক)  গুঞ্  জ   নে   ভ   রি'   ০   কু   ০   ০ঞ্   জ   ০   কল
(৭ক)  মঞ্   জু   তা   ম   ক   ০   র   ০   ০ন্   দে   ০   এস
(১১ক) ক   রু   ণা   য়   ভ   ০   রি   নে   ০০   ত্র   ০   এস
(১৫ক) সন্   তা   ন   গ   ণে   ০   ধ   ০   ০০   ন্য   ০   এস

   ০                ১         ২´          ৩
। র্সা  র্সা  জ্ঞর্া । জ্ঞর্া  র্মা  র্মা I জ্ঞর্া  জ্ঞর্া  ঋর্া । র্সা  র্সা  র্সা ।
(৪)   কু   জ   নে   ভ   রি   য়া   ন   মে   রু   কু   লা   য়
(৮)   হ্র   দ   স   রো   ব   র   ভ   রি   কো   ক   ন   দে
(১২)  মু   খ   রি   ত   ক   রি   গি   রি   কন্   দ   র   নি
(১৬)  বি   শ্ব   স্ত   রা   ০   স   ন্   তা   প   হ   রা   ০

   ০                ১         ২´          ৩
। মা  ণা  ণা । দা  -া  পা I মা  -পা  -দা । দা  -া } II
(৪ক)  রঞ্   জি   য়া   জ   ০   ল   ধ   ০   ০   রে   ০
(৮ক)  কু   মু   দে   ই   ন্   দী   ব   ০   ০   রে   ০
(১২ক) ঝ্   ঝা   র   ঝ   ০   র   ঝ   ০   ০   রে   ০
(১৬ক) বঙ্   গে   র   ম্ব   ০   রে   ম্ব   ০   ০   রে   ০
```


পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২০

চারুর এত ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে রাখুর দারিদ্র্য তাহাকে এমন জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল যে, চারুর সঙ্গে অতগুলা কথাবার্ত্তার পরেও তাহাকে রাখী অনুমান করিতে তাহার সাহস হইল না। চারু ফিরিয়া আসিলে, দেখিতে সে অবিকল রাখীর মত, কেবল এই কথা বলিবার জন্য আপনাকে রাখু সাহসী করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্য সত্যই চারু যদি রাখী হয়? এক রাত্রির দেখা-শুনায় একটা স্ত্রীলোকের এতই কি সে আপনার হইয়া গেল যে, তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপায়ন এত আগ্রহের সহিত তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে সে ছুটিয়া আসিল? একবার সে মনে করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই এই ঐশ্বর্য্যময়ী যদি তার স্ত্রী রাখীই হয়?

সেই যুগ পূর্ব্বের বাল-দম্পতির ভিতরে যৌনসম্বন্ধ না থাকিলেও, সুতরাং সম্বন্ধের অপব্যবহারে পত্নীর উপর ঈর্ষার কোনও কারণ না থাকিলেও চারুকে রাখী মনে করিতে কেমন তার একটা কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারিদ্র্য চারুর নিবেদিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক প্রীতিকর বোধ হইল।

যাহা বিশ্বাস করিবার নয়, তাহা বিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ করিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা। রাখু আবার সোফায় হেলান দিয়া মুদ্রিত চক্ষে তার চিরনির্ম্মম দুরবস্থা নিঙাড়িয়া যেটুকু মধু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাতেই এমন তার তৃপ্তি আসিল যে, চারুর ঘরের সৌন্দর্য্য আর তার দৃষ্টিকে মধুরতায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তৃপ্তির গাঢ়তায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

"ওরে বিশে, আ মর্ এখনও পড়ে' পড়ে' ঘুমুচ্ছিস? সকাল হয়েছে, উঠে পড়্।"

রাখু এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, ঝির কথা তার কাণে না গেলে আরও

কতক্ষণ পরে যে তার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিল। উঠিবামাত্র সে বুঝিতে পারিল—রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে।

তখন ঘরের দোর খুলিয়া বাহির না হইয়াই সে ডাকিল—

"চারু!"

চারুকে ডাকিতে ঝি আসিল। সে উপস্থিত হইয়াই বলিল—

"হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমি গড়গড়ায় জল ফিরিয়ে তামাক ঠিক করে' রেখেছি।"

"চারু?"

"গঙ্গাস্নানে গিয়েছে।"

"কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ—তখন বেশ ঘোর ছিল।"

বলিয়া সে গাড়ু হাতে লইয়া তার মুখ প্রক্ষালনের সাহায্য করিতে আসিল।

করুণ গীতে রাত্রির স্বপ্নবৎ জাগরণটাকে ঘুমন্ত করিবার জন্য প্রভাতী আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার রাখুকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল।

"আমাকে তুলে' দিলে না কেন?"

"দিদিমণি ঘুম ভাঙ্গাতে নিষেধ করে' গেছে।"

আলোকের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাখুর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঘুমিয়ে পড়াটা তার বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অন্য অন্য দিন অতি প্রত্যুষেই সে শয্যাত্যাগ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া একখানি নামাবলী গায়ে গঙ্গাজলেই সে তার নিত্যকর্ম্ম পূজাহ্নিক সারিয়া লয়, তারপর বাসায় আসিয়া সিক্ত বস্ত্র রক্ষা করিয়া যজমানদের বাড়ীতে পূজায় বাহির হয়। অত প্রাতঃকালে বাহির হইয়াও পূজা সারিয়া তার বাসায় ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়।

পূর্ব্বদিনে পূজার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখিয়া রাখু শ্রাদ্ধবাড়ীতে গিয়াছিল। আজ ত আর সে ব্যক্তি তাহার অবর্ত্তমানে কাজ করিবে না। রাখু এইবারে আপনাকে বিপন্ন বোধ করিল।

"ঝি, তামাক খাবার দেরী সইবে না, ঐ দোরের কাছে আমি কাল কাপড় চাদর রেখেছি, এনে দাও—এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"সেকি দিদিমণির ফেরবার অপেক্ষা কর্‌বেন না?"

"অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই।"

"তা কি হয়?"

"আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ? সে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।"

"না ঝি, আমি এখনি যাব। তোমার দিদিমণি এলে বলো, পারি ত আমি আর একদিন এসে তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কাপড়খানা এনে দাও।"

"তাইত, আমাকে যে তার কাছে মুখনাড়া খেতে হবে, ঠাকুরমশাই।"

"থাকতে পারলে আমি থাকতুম ঝি, আমাকে পাঁচ যজমানের বাড়ী পূজো করতে হয়।"

ঝি মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিতনেত্রে একবার রাখুর মুখের পানে চাহিল। এ ত ট্যানাপরা লক্ষপতি নয়—সত্য সত্যই গরীব ব্রাহ্মণ! সে ভূমিষ্ট হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল—বুঝিল, সত্য সত্যই ঝড়ে বিপন্ন হইয়া নারায়ণ গতরাত্রে বেহ্মার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিল। উঠিয়া সে আর কোন কথা না কহিয়া রাখুর কাপড় আনিতে গেল।

"কই বাবাঠাকুর, কাপড় যে দেখতে পাচ্ছি না!"

তার কথায় প্রত্যয় না করিয়া রাখু নিজে বারান্দায় গিয়া দেখিল, কাপড় নাই। কাপড় খুঁজিতে সে পূর্ব্বোক্ত ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে তার পরিধেয় ত দেখিলই না, যে গরদখানা সে ছাড়িয়াছিল, সেখানাও সে দেখিতে পাইল না।

"তাইত ঝি, আমি যে বিষম বিপদে পড়লুম।"

ঝি বলিল—"আপনি ততক্ষণ তামাক খান, আমি কাপড় খুঁজে দেখি।"

"তুমি গড়গড়া এই ঘরে এনে দাও।"

"কেন, ঐ ঘরে সোফার উপরে বসুন।"

তখন-পর্য্যন্ত-পাতা সেই গালিচার উপরে বসিয়া রাখু বলিল—

"না।"

ঝি তামাক দিয়া কাপড় খুঁজিতে গেল। চারিদিক খুঁজিয়া যখন উপর নীচে কোথাও সে দেখিতে পাইল না, তখন কলতলায় শেষ অনুসন্ধানে সে দেখিতে পাইল, ব্রাহ্মণের সেই মলিন বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া

আছে। তুলিয়া পরীক্ষা করিতে সে দেখিল—দিদিমণির অলক্তক-রঞ্জিত পদচিহ্ন তাহাতে পূর্ণভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। সে-কাপড় সে ব্রাহ্মণের কাছে আনিতে সাহস করিল না। রাখুর কাছে ফিরিয়া ঝি মিথ্যা বলিল—

"কাপড় পেলুম না। দিদিমণি অন্ধকারে মাড়িয়েছিল বলে' গঙ্গায় বোধ হয় কাচতে নিয়ে গেছে।"

রাখু প্রমাদ গণিল। একবার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চাহিল। দেখিবা-মাত্রই বুঝিল, রাত্রিকালের দীপালোকে অন্যমনস্কের চোখে কাপড়ের সৌন্দর্য্য সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। এ কাপড় পরিয়া কেমন করিয়া সে পথে বাহির হইবে? শুধু-পায়ে-পথ-চলা বামুনের এই কি-জানি-কত-টাকা মূল্যের বিচিত্র পরিধেয় দেখিয়া যদি পথের মাঝে কেহ তাহাকে কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করে! যদি এ চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পরিচিত লোকের সুমুখে পড়ে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসার কথা তার মনে উঠে নাই। মনে মনে সারা পথ চলিয়া পথের শেষে বাসার কাছে যেমন সে উপস্থিত হইল, অমনি সে যেন দেখিতে পাইল, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া বাসার সঙ্গীসকল এমন কি গৃহস্বামী পর্য্যন্ত তাহার চলিবার পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তার এই বিচিত্র পাড়-ওয়ালা কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আছে। বাড়ীর গিন্নী বাহিরে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বৌগুলা কপাটের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেছে।

সে সকল চাহনির ভিতরে কত প্রশ্ন, প্রতি প্রশ্নের ভিতরে কত রহস্য, প্রতি রহস্যের মাথায় চড়িয়া কত বিদ্রূপের হাসি! সেগুলা স্থানটাকে যেন এক বিষাক্ত কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত যজমানদের শুনাইবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িতেছে।

চিন্তার প্রহারেই রাখু ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

"ঝি আমাকে যে একখানা কাপড় দিতে হবে?"

"কি রকম কাপড়?"

"থান হ'লেই ভাল হয়।"

"মাসী থাকলে থান কাপড় মিলতে পারতো। তা পোড়া মাসী যে গুরুকেও বিশ্বাস করে না। সে সমস্ত কাপড় সিন্দুকে পুরে চলে গেছে।"

"তোমার কাছেও কি আমার পরবার মত একখানা কাপড় নেই?"

"আমার ব্যবহার করা কাপড় তোমাকে কেমন করে দেবো ঠাকুর-মশাই?"

রাখু সেই পট্টবস্ত্র পরিয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিঁড়ির দিকে দুইপদ যাইতেই ঝি বলিল—

"একান্তই যদি তোমার না গেলে চলবে না, তবে আর একটু দাঁড়াও। আমি আর একবার খুঁজে দেখি। কলতলায় কাদামাখা একখানি কাপড় দেখেছি।"

বলিয়া সে আবার নীচে চলিয়া গেল এবং রাখুর কাপড় চাদর যথাসম্ভব জল-কাচা করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

"তুমি আমাকে বাঁচালে ঝি।"

বলিয়া ঝিকে কাপড় দিবার অবসর না দিয়া নিজেই তাহার হাত হইতে বস্ত্র যেন কাড়িয়া লইল।

"তুমি ত বাঁচলে ঠাকুর, আমাকে যেন গাল খাইয়ে মেরে ফেলোনা। কখন আবার আসবে বল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আবার যেমনি রাখু ভিখারী-বেশী হইল, তখন সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিতে ঝিকে বলিল:—

"এখানে আর কি আমার আসা উচিত গা?"

ঝি দেখিল, দিদিমনির দেওয়া সেই দামী বেনারসী, ব্রাহ্মণের গায়ে জড়ান ময়লা কাপড় চাদরের পায়ে পড়িয়া যেন অতি দীনভাবে তাদের কাছে পবিত্রতা ভিক্ষা করিতেছে। সে বলিল—

"যদি ধর্ম্ম বজায় রাখতে চাও বাবা, তা' হলে তোমায় আর আসতে বলতে পারি না।"

"ঠিক বলেছ মা, এদিকে ত আসবই না—শুধু তাই নয়, এ কলকাতাতেও আর থাকবো না।"

"আবাগী পূর্ব্ব জন্মে কি পুণ্যি করেছিল।"

বলিয়া ঝি রাখুর চরণে আবার প্রণত হইল।

স্বপ্নাবৃত ঐশ্বর্য্যের বোঝা মন হইতে ফেলিয়া আবার রাখু পথে তার চির-সুহৃৎ দারিদ্র্যের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাসায় ফিরিয়া চলিল।

২১

সারা পথের ভিতর আর কেহ কারুর সঙ্গে কথা কহিল না। অবগুণ্ঠনবতী চারু অগ্রে, আর পূর্ব্বমত তাহারই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তার গুরু পশ্চাতে। তাঁর

গৃহ-প্রবেশের সাহায্য করিতে চারু যখন অবগুণ্ঠন ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল তখন গোঁসাইজী বলিলেন—"তোমাকে একটা কথা এই সময় বলা কর্ত্তব্য বলে' বলে রাখি।"

"বলুন।"

"শুনে বুঝে তার উত্তর দাও।"

গোঁসাইজীর কথার গুরুগাম্ভীর্য্যে চারু কোন কথা কহিতে পারিল না।

"চুপ্ করে রইলে কেন সরস্বতী।"

"বলুন।"

"সেই বেশ্যাটা গঙ্গায় ডুবে মরেছে, মনে কর।—মনে করেছ।"

"করেছি।"

"তা হ'লে তার স্বামীর কি হবে না হবে, সে আবাগী আর জান্‌তে আসছে না, কি বল? চুপ্ করলে চলবে না, শীঘ্র বল, গলি দিয়ে লোকজন চল্‌তে আরম্ভ করেছে, এরপর কথা কবার আর সুবিধা হবে না।"

"বাড়ীর ভিতর গিয়ে বল্‌লে চল্‌বে না?"

"না, বললে তোমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাব।"

গোঁসাইজীর কথা কোথায় গিয়া কি ভাবে দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিয়া যা'হোক একটা উত্তর দেওয়ার মত করিয়া চারু বলিল—

"যখন মরে গেছে, তখন সে আবাগী আর কেমন করে জানতে আসবে!"

"তা'হলে সেই নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বামুন যদি সেই বেশ্যাটার খুনের দায়ে বাঁধা পড়ে, তাকে কে রক্ষা করবে সরস্বতী?"

"ভগবান।"

"বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"সত্যি সত্যি, কোমরটায় মন্দ লাগেনিরে'!"

চারু প্রথমে বৃদ্ধকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের সাহায্য করিল। পরে নিজে প্রবেশ করিল। বুঝিল, বুঝি জগতের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য লুকাইতে সে গুরুগৃহে প্রবেশ করিতেছে। মনে করিতেই তাহার মাথাটা কেমন আপনা আপনি ঘুরিয়া গেল। সে দোরের উপর উঠিয়াই গুরুর দেহের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না, একহস্তে চারুকে ধরিয়া অন্য হস্তে

বহির্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তারপর চারু তাঁহাকে আবার ঘরে লইয়া যাইতে যেমন তাঁহার হাত নিজ স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিল, অমনি সে গুরুর মুখ হইতে শুনিল কি করুণামাখা কোমল স্বর!—

"হাঁ মা, এ বুড়ো ছেলের ভার নেওয়াটা কি তোর ভাল লাগছে না?"

"ওকথা আর বলবেন না বাবা, বল্‌লে আমি মরে যাব।"

"তাই বল, আমার শেষ বয়সের যষ্টি, তোর কথা শুনে আশ্বাস পাই।" বলিয়াই গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন "দামোদর, আরে মর—এখনও ঘুমুচ্ছিস্ নাকি—দামু!"

ভৃত্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র বাড়ীর ভিতর হইতে গোঁসাই-গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

আরও অনেক কথা ব্রাহ্মণী বলিতে যাইতেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাঁর আর বলা হইল না।

"সঙ্গে মেয়েটি কে?"

"কাছে এসে দেখো।"

"কে গো, চারু? তুই এমন সময় কোথা থেকে উপস্থিত হলি?"

গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া চারু গুরুপত্নীর পদতলে প্রণত হইল। গোঁসাই-গিন্নি চারুকে সে সময়ে দেখিয়াই যে বিস্মিত হইলেন, এমন নহে। তাহার নীরবতা, তাহার মুখ চেখের ভাব বিশেষতঃ পশ্চাতে অবনত মস্তকে চারুর পানে চোখ রাখিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দণ্ডায়মান স্বামীর কেমন এক রকম নূতন-তর মধুর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এমন একটা গভীর বিস্ময় তাঁহাকে মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, যে যদ্যপি গোঁসাইজী ভৃত্য দামুকে আবার ডাকিয়া স্থানের নীরবতা না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না।

"দামোদর কি বাড়ীতে নেই গিন্নি?"

"থাকলে কি সে উত্তর দিত না। তিনটে দোর হাট করা খোলা, অথচ তুমি নেই, সে ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজতে গেছে। আমিও এতক্ষণ পথের পানে চেয়ে দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।"

"ভালই হয়েছে, এখন তুমি আমি ছাড়া আর এখানে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। মেয়েটাকে চিন্‌তে পারছ ব্রাহ্মণী?"

"আমার চোখে ছানি পড়েছে না ভীমরতি হয়েছে—আজ এমন দুর্য্যোগে, এমন অসময়ে ওঁর কাঁছে কি জন্য এসেছিলি ভাই চারু ?"

"ভুল করে ফেল্লে ব্রাহ্মণী, ও চারু নয়।"

চারু এখন দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা স্বামীর এ কথার পর থতমত খাওয়ার মত চারুর মুখের দিকে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণ এবারে চারুকে বলিলেন—

"কি গো মা, তুই কি চারু ?"

চারু গোঁসাই-গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গোঁসাইজীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—

"সেই পাপিষ্ঠা বেশ্যা আজ গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আমি তাকে তুলতে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে এই কন্যারত্নটী কুড়িয়ে পেয়েছি। কাঠামো দেখে ভয় পেয়ো না। আচার্য্য গোস্বামীর কুলবধু। তোমার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্মরণ কর। তিনি কাঠামো দেখে ভয় পান নি, জাতির নীচতা দেখে ভীত হন নি, সমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, যে লক্ষণযুক্ত রত্ন দেখেছিলেন, সেখান থেকেই তাকে তুলে এনে নিজের পরিবারভুক্ত করেছিলেন। চারু নয়, গঙ্গার ভিতর থেকে সেই মরা অভাগীর মূর্ত্তি ধরে মা-সরস্বতী কুলে উঠেছে। উঠেছে কন্যা হতে,—তোমাকে আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ চারুর চিবুক ধরিয়া পত্নীর দিকে তার মুখ তুলিয়া বলিলেন—

"নাও চুমো খেয়ে মাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ কন্যা স্বামীর কথার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আবরণের অর্থ বুঝিতে ত পারিলেনই না, চারুকে লইয়া কি যে করিবেন, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া তিনি কেবল তাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া গোঁসাইজী বলিলেন—

"নিতে সঙ্কোচ হচ্চে ব্রাহ্মণী ?"

"না না, সত্যই কি চারু—"

"চারু নয় গো, সরস্বতী"

"সত্যই কি মা সরস্বতী, তুই বুড়ো-বুড়ীর ঘর আলো করে থাকতে এসেছিস্ ?"

"আমাকে থাক্‌তে দেবে মা ?"

চারুর চিবুক করস্পর্শে চুম্বিত করিয়া দুটী হাতে তাহাকে বেড়িয়া গঙ্গা-নারায়ণ-পত্নী তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

ঘরে লইয়া যখন ব্রাহ্মণ-কন্যা চারুর মুখ হইতে সমস্ত ইতিহাস শুনিলেন, তখন তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"এস মা, তোমার ঘরে যেখানে যা আছে, সব বুঝে পড়ে নেবে এসো। বুড়ো তোমাকে সরস্বতী বল্‌লে কেন, আমি বলবো গঙ্গা। আমাকে মা বলে ডাকতে উথলে আমার কোলে এসেছে ?"

এক মুহূর্ত্তে একটা বার বছর ধরে ভুল করা মেয়ে এক সাধুদম্পতীর কৃপায় তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণের নিকষমণি।

ইরাণী উপকথা।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

বাংলা সাহিত্যে একখানা আসল সৃষ্টি, খাঁটি প্রতিভার দান। সুরেশ-চন্দ্রের এক একটি গল্প, এক একটি সজীব ভাবমূর্ত্তি—চলনের চাতুর্য্যে, বলনের বৈদগ্ধ্যে, একটা অনাস্বাদিতের ব্যঞ্জনায় তাহা ভরপুর। সুরেশচন্দ্র সেই একজন শিল্পী যিনি তাঁর যাদুবিদ্যায় আমাদিগকে যেন আবার ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন বহুদিনের হারান অথচ গোপনে নিত্য অনুভূত একটা জগতের মাঝে, আমরা পাই এমন একটা জগৎ যাহা শৈশবের জগতের মত তরুণ সবুজ কল্পনাময়, হাস্যময়, সেই সাথেই আবার যাহার মধ্যে মিশিয়া আছে কি একটা সত্যিকার জ্ঞানের নিরেট জগৎ, প্রৌঢ়ত্বের দৃঢ় উপলব্ধ তত্ত্বরাজ্য।

মানুষ আজকাল যেমন স্থূলচক্ষু হইয়াছে, এমন বোধ হয় সে কোন দিনই ছিল না। তাহার শিল্পে সাহিত্যে তাই দেখিতে পাই বেশীর ভাগ বাহিরের জীবনের কথা, সাধারণ ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট জগতের কথা। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে, ব্যবহারের জগতের মধ্যে যে সব শক্তির বা সত্যের খেলা চলিয়াছে হুবহু তাহাকে ফলাইয়া বা কল্পনায় তাহাকে রঙাইয়া দেখাই বহু শিল্পীর ধর্ম্ম হইয়াছে। এই ঘোর বাস্তবিকতা যতই কেন আমাদের প্রয়োজনের বা লাভের বস্তু হউক

না, প্রাণ সময়ে সময়ে সত্যই ইহাতে হাঁপাইয়া উঠে। আমরা চাই আলোর হাসির অপ্রয়োজনের অসম্ভবের কথা। কিন্তু নিছক রূপকথার যে সহজ ছেলেমানুষী তাহাতে বাস্তবিকই আমাদের তৃপ্তি হইতে পারে না, এমন কঠিন যুক্তির যুগে আমাদের মনের ছাঁচে সে রকম সৃষ্টি ধরা পড়িবেই না। তাছাড়া রূপকথা বা উপকথার গল্প—আরব্যউপন্যাস হউক আর ঠাকুরমার গল্প হউক—তলাইয়া দেখিলে, বাস্তবিকতারই রূপান্তর মাত্র, বাস্তবিকতাকে একটু টানিয়া বাড়াইয়া বলা মাত্র।

সুরেশচন্দ্র তত্ত্বের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া একটা তৃতীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিয়াছেন একটা কামলোকের চিত্র, মানুষ যেখানে মানুষই আছে কিন্তু এই স্থূলদেহের খোলস ফেলিয়া দিয়া আছে নিবিড় গোপন মৌলিক কতকগুলি আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা লইয়া, ইহাদের অবাধ লীলা ও চরিতার্থতা, অন্ততঃ চরিতার্থতার সম্ভাবনা লইয়া। ইহা একটা সূক্ষ্ম জগৎ, বাস্তব অবাস্তবের কঠিন ব্যবধান যেখানে নাই—সূক্ষ্মের ভাবের শক্তি যেখানে স্থূল উপকরণ লইয়া যথেচ্ছ খেলিতে পারে—ছবির মানুষে যে প্রাণশক্তি নিথর জমাট তাহাই আর এক প্রাণের টানে দুলিয়া উঠিতে পারে, ছবির মানুষ জীবন্ত মানুষকে অনুসরণ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে (ইরাণী উপকথা); অন্তরে আমার যে মানুষ ভাবে মূর্ত্ত, ভাবের শক্তিতে বাহিরেও তাহা ভিন্ন মানুষকে ধরিয়া রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারে (একটি অসম্ভব গল্প)। মানুষের কামলোকের মুক্তসত্তা, পার্থিবলোকের বদ্ধ রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে পড়িয়া কেমন ব্যহত হইতেছে, ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পাড়িতেছে না, এই নিবিড় দ্বন্দ্ব বা ট্রাজেডিটিও আমাদের শিল্পী কেমন করুণ অথচ কোমল মৃদুল অবলেপে—আঁকিয়া দিয়াছেন (একটি সত্য গল্প, একটি আষাঢ়ে গল্প)। এই সূক্ষ্ম কামলোকেরই একটা নিছক তত্ত্ব ইহলোকের আবরণে আবেষ্টনে মুড়িয়া, রূপকে ঢালিয়া তিনি দিয়াছেন তাঁহার "ছোট উপকথায়।

জড়ের কঠিনের নিয়মের সত্যকে ভাঙ্গিয়া যিনি নীচের টানা স্রোতের মুক্তগতির খোঁজ পাইয়াছেন, যাঁহার অনুভবে জাগিয়াছে মিলের যতি অপেক্ষা ছন্দের সুর, তাঁহার মধ্যে পাইব যে একটা অনির্দ্দেশ্যের রেশ, শেষ-না-হওয়ার জের তাহাও খুব স্বাভাবিক। অন্তরীক্ষবাসী শিল্পীর দৃষ্টি যেন আরও উপরে কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাই সুরেশচন্দ্রের প্রত্যেক আখ্যায়িকা আমাদিগকে লইয়া ছাড়িয়া দেয় এমন একটি যায়গায় যেখানে গল্প শেষ

হইলেও কথা শেষ হয় নাই। "সমুদ্রের ডাকে" মানুষের এই রকম একটি কামনা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, যাহা লক্ষ্যহীন অর্থাৎ কামনাহীন কামনা, অহেতুক কামনা—কাম লোকের চরম কথা; মানুষের মানবীয় কামনা যেখানে নাই, বিশ্বসৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গীভূত হইয়া যাওয়াই যেখানে মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা।

আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত খুবই পরিচিত। অতীন্দ্রিয় আত্মার কথাও যথেষ্ট জানি। কিন্তু সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন, আমাদিগকে জানাইয়াছেন একটা অন্তর্বর্ত্তী লোকের তথ্য, একটা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব (psychic sensibility)। সুরেশ চন্দ্রের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে উঠিয়াছে পাশ্চাত্যের একজন শিল্পীর কথা। Oscar Wideএর The House of Pomegranates, The Picture of Dorian Grey প্রাণের অনুরূপ ধাতৃ,দৃষ্টির অনুরূপ ভঙ্গীই দেখাইয়াছে। শুধু তাই নয়, রচনা-প্রণালীর সম্বন্ধেও একটা সাদৃশ্য যে পাওয়া যায় না তাহা নয়; যাহাকে বলে jewelled style ফরাসী সাহিত্যের যাহা অতি সুলভ ও সহজ বস্তু, ইংরাজীতে তাহা চমৎকার ভাবে দিয়াছেন Oscar Wilde—বাংলায় সুরেশ চন্দ্র সেই ভঙ্গীমায় দেখাইয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব।

বীরবলের টিপ্পনী।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কৃত—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। প্রিণ্টার ও প্রকাশক সুরেশ চন্দ্র মজুমদার—দাম আট আনা।

সেদিন ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান" নাম দিয়ে এক বক্তৃতা পড়েছেন—বক্তৃতাটা কতকটা রাজনীতির আর কতকটা চিরন্তন রীতির। ঐ বক্তৃতায় কবি বাঙালীকে কতকগুলো ছাপ ছাপ কথা শুনিয়েছেন। ঐ বক্তৃতার দিন চারি পর এক বন্ধুর মুখে ওর একটা টিপ্পনী শোনা গেল। টিপ্পনীর ভাষা হচ্ছে—কবি মানুষ কবিতা নিয়ে থাকুন রাজ-নীতিতে তার কথা বলার কি প্রয়োজন—আর তার ভাব হচ্ছে কবি বা সাহিত্যিকের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অনধিকার চর্চ্চা করা।

আমাদের কিন্তু ধারণা উল্টো। সাহিত্যিকের অধিকার কলম চালানো। এবং তা কোন্ বিষয়ের ওপর তার কোন সীমা নেই। প্রাচীন মিশরের "মমি" থেকে আরম্ভ করে আধুনিক Mount Everest এর expedition পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে সাহিত্যিকের কথা বলবার অধিকার আছে। এ দুয়ের মধ্যে অবশ্য রাজনীতি সমাজনীতি বাদ পড়ে না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার মর্জ্জির উপরে এবং সে কথায় যদি ভাব ও রস থাকে তবে তা সাহিত্য হবে আর তা যদি না থাকে তবে তা waste paper basketএ যাবে। দেশের লোকে তা শোনে শুনুক না শোনে না শুনুক। তাই বলে সাহিত্যিকের কলমকে পাঠকরা ধরে রাখ্‌তে পারে না—কেন না সাহিত্যিকের মনটা ও মর্জ্জিটা তার নিজস্ব জিনিস।

ওপরে এত কথা বলবার মানে "বীরবলের টিপ্পনী" হচ্ছে অধিকাংশই আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ওপরে টীকা ও ভাষ্য, স্থানে স্থানে

অবশ্য নূতন সূত্রও আছে—অথচ প্রমথবাবুর নাম আমরা কোন রাজনৈতিক আড্ডার খাতায়ই দেখ্‌তে পাই নে। তবুও যে আমরা এ বই খানিকে অনধিকার চর্চ্চা বল্‌ছি নে তার কারণ আমাদের ঐ উপরিউক্ত মনোভাব। আর প্রমথবাবু যে একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে অন্ততঃ সাহিত্যিকদের মহলে দু'মত নেই।

বীরবলের লিখবার ষ্টাইল বাংলা সাহিত্যে একটা একেবারে নতুন জিনিস। বীরবলের কথায় সায় না দিলেও তাঁর লেখায় যে একটা রস আছে তা কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য নিতান্ত অরসিকের সম্বন্ধে আলাদা কথা। বীরবল দেশের মডারেটে ও extremistদের এই ব্যাখা দিচ্ছেন—"যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত করুণরসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য বীররসাত্মক। এত হবারই কথা, কেন না মডারেটরা উদ্ধারের সেরা উপায় বের করেছেন ব্যুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremistরা সেরা উপায় স্থির করেছেন ব্যুরোক্রাসিকে, গালাগালি করা।" উপরের ঐ কথার ভঙ্গী দেখে কেউ স্থির না করেন যে বীরবল একজন পলিটিক্যাল নাস্তিক। আসলে তাঁর আস্তিক্য দু'দিকেই। কেননা ওর পরেই বলছেন—"পলিটিক্সএ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে" তবে তিনি যে কথাটা বল্‌তে চান্ সেটা হচ্ছে এই যে "নাকি-করুণ ও খেঁকি-বীর এ দু'ই আমার কানে সমান বেসুরো লাগে।"

বীরবলের লেখার একটা বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে ঠাট্টা করতে করতে দু'ঠাট্টার মাঝখান দিয়ে কতগুলো সত্য কথা বলে নেওয়া। এ বইখানাতেও তার প্রচুর প্রমান আছে। সাহিত্য ও পলিটিক্সের বিচার করতে গিয়ে তিনি বলছেন—"সাহিত্যের ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। * * *। এবং * * যে ক্ষেত্রে প্রথমটীর যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টীর তত প্রভাব।"

রাজনৈতিক হৈচৈতে যে সব ভিতরের কথা চাপা পড়ে যায় ভিতরের সেই সব অনেক কথা এই ষ্টিপ্পনীতে টেনে বের করা হয়েছে—কোথাও রহস্যের আবরণে কোথাও বা সহজ সোজা ইঙ্গিতে। যিনিই এটা হাতে নেবেন তিনিই দেখবেন যে এই সওয়া শ' পৃষ্ঠার বইখানি বিদ্রূপ ও কৌতুক, satire ও সত্য কথা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতায় মিলে একটা পরম উপভোগের সামাগ্রী হয়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাস এ বই যিনি পড়বেন তাঁর মূল্য ও মজুরি দু'ই পুষিয়ে যাবে। হাতে ফাউ স্বরূপ থেকে যাবে দেশের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয়।